পাক্ষিক

আহমদী

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ৭ ও ৮ম সংখ্যা
১৪ই ভাদ্র ১৩৯২ বাংলা ॥ ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং ॥ ১৪ই জেলহজ্ব ১৪০৫ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ঃ পাউণ্ড

পবিত্র ঈদুল আযাহা উপলক্ষে পাক্ষিক আহমদীর সকল পাঠক-পাঠিকা ও দেশবাসীর খেদমতে জানাই আন্তরিক 'ঈদ—মোবারক'।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ৩৯শ বর্ষ: ১৫ ও ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৫ ৭ ও ৮ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইউনুস (১১শ পারা, ৪র্থ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৮
* পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি : (জুময়ার খোৎবার সারসংক্ষেপ)	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—৩ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২০
* মৌদুদীর আয়নায় ওফাতে ঈসা ও নজুলে মসীহ :	জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৯
* ঈদুল আযহার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুইয়া	৩৩
* প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী (আ:) : কিছু জিজ্ঞাসা :	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৪৩
* একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি :	সেক্রেটারী, উমরে আমা বা: আ: আ:	

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ৭ ও ৮ম সংখ্যা

১৪ই ভাদ্র ১৩৯২ বাংলা : ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং : ৩১শে যহুর ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউনুস

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে]

১১শ পারা **৪র্থ রুকু**

৩২। তুমি (তাহাদিগকে) বল, আসমানসমূহ ও যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিয্‌ক দেয় অথবা কে কান ও চোখ সমূহের উপর আধিপত্য রাখে এবং কে মৃত বস্তু হইতে জীবিত বস্তুকে বাহির করে এবং জীবিত বস্তু হইতে মৃত বস্তুকে বাহির করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে ? তখন অবশ্যই তাহারা বলিবে. আল্লাহ (করেন,) অতএব তুমি বল, তবুও কেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর না ?

৩৩। অতএব তিনি আল্লাহ, (যিনি এই সব কিছু করেন) যিনি তোমাদের প্রকৃত রাব্ব্‌ হককে বাদ দিলে গোমরাহী ছাড়া আর কি (লাভ) হইতে পারে ? অতএব (তুমি বল্‌) কিভাবে তোমাদিগকে অন্য দিকে ফিরানো যাইতেছে ?

৩৪। এইরূপ যাহারা অবাধ্য আচরণ অবলম্বন করে, তাহাদের উপর তোমার রাব্বের কথা সত্য সাব্যস্ত হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

৩৫। তুমি (তাহাদিগকে) বল, তোমাদের (বানানো) শরীকগণ হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করে এবং উহা পুনর্বার (সৃষ্টি) করে ? তুমি, বল, আল্লাহই প্রথমবার সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহা পুনর্বার (সৃষ্টি) করেন ; অতএব (তুমি বল,) তাহাদিগকে কোন্‌ দিকে ফিরানো হইতেছে ?

৩৬। তুমি (তাহাদিগকে ইহাও) বল, (তোমাদের (বানানো) শরীকগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে হকের দিকে (জনগণকে) হেদায়ত করে ? (তাহারা কি উত্তর দিবে ?) তুমি নিজেই বল, কেবল আল্লাহই (জনগণকে) হকের দিকে হেদায়ত করিয়া থাকেন ; অতএব (সেই খোদা) যিনি হকের দিকে হেদায়ত করেন, তিনি অনুসৃত হওয়ার অধিকতর যোগ্য অথবা যে (কল্পিত খোদা) নিজেই (হকের দিকে)

পথ খুঁজিয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়? বল, তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কিরূপ ফয়সালা করিতেছ?

৩৭। এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কেবল (নিজেদের) অনুমানের অনুসরণ করে, অথচ অনুমান হকের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না; তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয় আল্লাহ সেসম্বন্ধে ভাল ভাবে জ্ঞাত আছেন।

৩৮। এবং এই কুরআন আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দ্বারা মিথ্যা রূপে রচিত হওয়া সম্ভব নহে, বরং ইহা উহার (অর্থাৎ সেই কালামে ইলাহীর) তসদীক (করে,) যাহা ইহার পূর্বে (মওজুদ) আছে, এবং ইহা এলাহী কিতাবের (মধ্যে যাহা থাকা আবশ্যক উহার) ব্যাখ্যা (করে); ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা সকল জগতের রাব্বের পক্ষ হইতে (নাযেল করা হইয়াছে)।

৩৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে সে ইহাকে নিজে রচনা করিয়াছে? তুমি (তাহাদিগকে) বল, তোমরা যদি (এই কথায়) সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটিই সুরা বানাইয়া পেশ কর এবং (এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্যার্থে) আল্লাহ ব্যতিরেকে যাহাকে তোমাদের সাধ্যে কুলায় ডাক।

৪০। (কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ঠিক নহে) বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে) তাহারা এমন বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহার (সম্বন্ধে) তাহারা পুর্ণ জ্ঞান হাসিল করে নাই এবং এখনও ইহার হাকিকত তাহাদের উপর প্রকাশিত হয় নাই; তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব তুমি দেখ সেই যালেমের কি পরিণাম হইয়াছিল?

৪১। এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে এবং কতক যাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না; এবং তোমার রাব্ব ফসাদকারীগণকে ভালভাবে জানেন।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ —**হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)**

হাদিস শরীফ

ইসলামের অবনতি এবং মুসলমান ও আলেমদের বিকৃতি

১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"আমার উম্মতের উপরও ঐ অবস্থা উপস্থিত হইবে, যাহা বনি-ইস্রায়েলে হইয়াছিল। ইহা এরূপ সদৃশ হইবে যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সদৃশ হয়। এমন কি, যদি উহাদের কেহ তাহার মায়ের সহিত কুকর্ম করিয়া থাকে তবে আমার উম্মতেও এরূপ কোনো দুরদৃষ্ট বাহির হইবে। বনি-ইস্রায়েল বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হইবে। কিন্তু এক সম্প্রদায় ব্যতীত বাকী সব আগুনে যাইবে।" সাহাবীগণ (রাযি:) জিজ্ঞাসা করিলেন : উহা কোন সম্প্রদায় ; ইয়া রাসুলুল্লাহ ? তিনি (সা:) ফরমাইলেন : "ঐ সম্প্রদায় যাহারা আমার এবং আমার সাহাবাগণের (রাযি:) "সুন্নত" (অনুবর্তীত নিয়মাচার) পালন করিবে।" (তিরমিযি ; 'কিতাবুল ঈমান ; 'বাবু ইফতেরাকু হায়েতিল উম্মাহ ; ২ : ৮৯ এবং জামযুস সগীর ; মিশর সংস্করণ ২ : ১১০ পৃ:)

২। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

'শীঘ্র এরূপ যামানা উপস্থিত হইবে, যখন নাম ছাড়া ইসলামের কিছু বাকী থাকিবে না। অক্ষর বা শব্দ ভিন্ন কুরআনের কিছু বাকী থাকিবে না। অর্থাৎ, আমল খতম হইয়া যাইবে। ঐ সময়ককার মানুষের মসজিদগুলি ত বাহ্যতঃ আবাদ বলিয়া দেখাইবে, কিন্তু হেদায়ত হইতে খালি হইবে। তাহাদের উলামা আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী হইবে। তাহাদের মধ্য হইতেই 'ফিৎনা' উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করিবে।" অর্থাৎ সব মন্দের উৎস তাহারাই হইবে। ('মিশকাত ; কিতাবুল ইলম, ফাসলুস সালেস, ৩৮ পৃ: ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৪২ পৃ:)

৩। বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমার উম্মতের উপর একটা যুগ উপস্থিত হইবে, যখন উদ্বেগ ও অস্থিরতার অবস্থায় লোকে তাহাদের উলামার নিকট যাইবে পথ প্রাপ্তির আশায় কিন্তু তাহারা উহাদিগকে বানর ও শূকরানুরূপ প্রাপ্ত হইবে।" 'কানযুল উম্মাল ; ৭ ম খণ্ড : ১৯০ পৃ:)

মানবতার সম্মান, সর্বজনীন গ্রন্থ, দুর্বলের প্রতি স্নেহ, পশুর প্রতি দয়া

৪। হযরত আবু যার্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "এক ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহার খুব তৃষ্ণা হইল, সে এক কূপে গেল এবং উহাতে নামিয়া পানি পান করিল। সে বাহির হইয়া দেখিল কি, একটি কুকুর 'হপ্ হপ' করিতেছে এবং ভিজা মাটি পিপাসার তাড়নায় চাটিতেছে। এই দেখিয়া সে মনে মনে বলিল: পিপাসায় এই কুকুরেরও তেমনি কষ্ট হইতেছে, যেমন আমার হইয়াছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কুয়ায় নামিল, তাহার (চামড়া দিয়া তৈরী) মুজায় পানি ভরিল এবং উহা মুখে ধারণ করিয়া উপরে উঠিল। কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহতায়ালা তাহার এই কাজটি কবুল করিলেন এবং তাহাকে মার্জনা করিলেন।" সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন: 'হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)! চতুষ্পদ জন্তুদিগের প্রতি দয়া করিলেও কি আমরা সওয়াব পাইব?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর প্রতি দয়ায় সাওয়াব আছে।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে: "এক পিপাসিত কুকুর কুয়ার চারিদিকে ঘুরাফেরা করিতেছিল এবং পিপাসায় তাহার প্রাণ যাইতেছিল। হঠাৎ বনি-ইস্রাইলের এক ভ্রষ্টা মেয়েলোক তাহা দেখিয়া জুতা খুলিয়া উহাতে পানি ভরিয়া কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহতায়ালা তাহার এই পুণ্যের কারণে তাহাকে মার্জনা করিলেন।" [বুখারী 'কিতাবুল মাওয়াসাহ; 'বাবু সেকা; ৎ: ৩৯৮ পৃঃ]

৫। হযরত আবু ইয়ালা সাদ্দাদ বিন আউস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা প্রত্যেককেই নম্র ও দয়াদ্র ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন; এমন কি যদি তোমরা কোন জন্তুকে মার্, তবে ইহাতেও দয়া প্রদর্শন করিবে। যখন কোন জন্তু জবাই কর, তখন উত্তম ও দয়াপূর্ণ উপায়ে জবাই করিবে। যেমন, ছুরি খুব তীক্ষ্ণ ধারালো করিবে এবং এই প্রকারে তোমার জবাইর জন্তুকে আরাম পৌঁছাইবে।" ['মুসলিম; কেতাবুস্-সাইদে ওয়ায্ যাবায়েহ; 'বাবুল আমরু ১-২: ২৫৫ পৃঃ]

৬। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ায় এক স্ত্রীলোক সাজা পাইয়াছিল। সে ঐ বিড়ালকে আবদ্ধ রাখিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। খাবারও দেয় নাই, পানিও দেয় নাই; উহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই যাহাতে ভূমি হইতে ইঁদুর প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত। এই জুলুমের ফলে তাহাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল।" ['মুসলিম; কিতাবুল হায়াত; 'বাবু তাহ্রীমে কাৎলিল হির্রাহ্'; ২: ৪০ পৃঃ]

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনোওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হয় না যাহা সব্‌র বা ধৈর্যের দ্বারা সাধিত হয়। ধৈর্যচ্যুত কখনও হইবে না। যে সব্‌র করে না সে আমার জামাতভুক্ত নয়।

"যদি মানব তাহার সত্তায় আল্লাহর সহিত সম্পর্ক-মুক্ত হইত, তাহা হইলে কোন সন্দেহ নাই যে, বড়ই বিপদ ঘটিত। কিন্তু বস্তুতঃ প্রতিটি অনুপরমানুর সংরক্ষণ সেই অদ্বিতীয় মহান আল্লাহই করিতেছেন। তারপর কিসের চিন্তা বা ভয়?! তাঁহার মহিমা ও কুদরত সমূহ কল্পনাতীত এবং তাঁহার হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ-লীলাসমূহ অনুপম ও নজিরবিহীন। সর্বশক্তিমান খোদাকে মানিয়া মুমেন কখনও চিন্তান্বিত ও দুঃখীত হইতে পারে না। তিনি যাহা চাহেন করেন, এবং তিনি যাহা করেন, উহাতেই কল্যাণ ও আশিস হইয়া থাকে। মুমেন ও অমুমেনের মধ্যে ঈমানের এই পার্থক্যই তো বিদ্যমান। নাস্তিকতা ভাবাপন্ন এবং আল্লাতে অবিশ্বাসীর জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাল এবং ভয়-ভীতি ও আতঙ্কমুক্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপরে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের আক্রমণ না ঘটে। কিন্তু যখন সামান্যতম বিপদও তাহার উপর আপতিত হয়, তখন তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায় এবং সে বরদাস্ত করিতে পারে না। আল্লাহতায়ালার উপর আদৌ তাহার আশা-ভরসা থাকে না এবং পার্থিব উপকরণ তাহাকে নিরাশ করিয়া তুলে। এমতাবস্থায় তাহাদের বাসনা-কামনা ও মেযাজ-মর্জি বিরোধী সামান্য সামান্য বিষয়ের উপরও অনেক সময় এই শ্রেণীর লোক আত্মহত্যা করিয়া বসে। ইউরোপ যেখানে বিপুল সংখ্যক লোক নাস্তিক, সেখানে এত বেশী আত্মহত্যা সংঘটিত হয় যে জগতের অন্য কোন অঞ্চল বা দেশে উহাদের তুলনা নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, তাহারা দুঃখ-বেদনা এবং বিপদাবলী সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের অন্তর দুর্বল। কিন্তু ইহার বিপরীত মুমেন মজবুত দিলের অধিকারী হইয়া থাকে। তাহার উপর যখন বিপদাবলী আসে তখন সেগুলি তাহার হিম্মত ও মনোবলকে দুর্বল করিতে পারে না, বরং বিপদকালে সে তাহার কদম আরো আগে বাড়ায়। তাহার ঈমান আরো মজবুত হয়। সত্য বলিতে কি, ঈমানের স্বাদ ঐ দিন গুলিতেই পাওয়া যায়। ঈমান সেই সময়ের জন্যই নির্ধারিত। ভাল অবস্থায়—যখন না কোন আর্থিক সংকট থাকে, না দৈহিক কষ্ট—বরং সর্ব প্রকারের সুখ-সাচ্ছন্দ

ও শান্তি বিরাজ করে, তখন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের অবস্থা (দৃশ্যতঃ) সমানই হইতে পারে কিন্তু দুঃখ-দ্বন্দ্ব, অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য বিপদাপদের সময়ে ঐ সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং প্রমাণ হইয়া যায়, কে আল্লাহতায়ালার সহিত দৃঢ় সম্পর্ক রাখে এবং তাঁহার কুদরত সমূহে ঈমান আনে এবং কে তাঁহার সম্বন্ধে অভিযোগ করে ও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-বেদনা ঈমান পরীক্ষার পূর্ণ মানদণ্ড। উহার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়, কে সব্‌র করে, ধৈর্য ধারণ করে।

সব্‌র বা সহণশীলতা কি ? উহা ঈমানেরই ফলশ্রুতি বিশেষ। বিপদকালে মুমেন যখন ধৈর্য ধারণ করে, তাহার সেই ধৈর্য বা সব্‌র এক নতুন রঙে প্রতিভাত হয়। কাফের সেইরূপ সবরের সহিত সঙ্গতি লাভ করিতে পারে না। এতদভিন্ন, তাহার সহিত খোদাতায়ালার কুদরত এক নতুন রংগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সত্য বলিতে কি, তখন যেন এক নতুন খোদার সন্ধান পাওয়া যায়। সেইজন্য তাহার উপর ঈমান আনিয়া মা'রেফত তথা ঐশী জ্ঞান-তত্ত্বে উন্নতি সাধিত হয়।

যখন মুমেন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর কারণে দোওয়া করে, তখন উহাতে দুই প্রকারের ফায়দা হয়। প্রথমতঃ সেই সকল বিপদ স্বয়ং তাহার পাপসমূহ মোচনের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ দোওয়ার দ্বারা ঐ সকল বিপদ হইতে নিস্কৃতি লাভ হয় এবং আল্লাহতায়ালা এবং তাঁহার কুদরত সমূহের উপর ঈমান বাড়ে।" (মলফুজাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩-৪৪)

"তোমাদের জন্য জরুরী যে, তোমরা নবী-রসুলগণের (পদাঙ্ক) অনুসরণ কর।"

"তোমরা নিজেদের পবিত্র নমুনা ও উত্তম চাল-চলনের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

"আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, কখনও ধৈর্য-হারা হইবে না। সব্‌রের অস্ত্র এমন যে, তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হইতে পারে না যাহা সব্‌রের দ্বারা সাধিত হয়। একমাত্র সব্‌রই মানব হৃদয়কে জয় করিয়া ফেলে। নিশ্চয় মনে রাখিবে যে, আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই যখন শুনিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তি এই জামাতে থাকিয়া কাহারও সহিত ঝগড়া করিয়াছে। এরূপ আচরণ আমি কাহারও ক্ষেত্রে পছন্দ করি না, এবং খোদাতায়ালাও চাহেন না যে, জগতে এক নমুনা ও আদর্শ হিসাবে যে জামাত নিরূপিত হইবে উহার ব্যক্তিবর্গ সেই পথ অবলম্বন করুক যাহা তাকওয়ার পথ নহে। বরং আমি তোমাদিগকে ইহাও জানাইতেছি যে, আল্লাহতায়ালা উক্ত বিষয়ের এতখানি তাকিদ করিয়াছেন যে, যদি কেহ এই জামাতে থাকিয়া সব্‌র ও ধৈর্য সহকারে কাজ না করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে, সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

"যখন আমি নিজে সব্‌র করি, তখন তোমাদের কর্তব্য যে তোমরাও সব্‌র কর। বৃক্ষ অপেক্ষা ইহার শাখা সমূহ বড় হইতে পারে না।" (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)

অনুবাদ : মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৫ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা সুরা হামিম সেজদার নিম্নোক্ত ৬ ও ৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

وقالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه و فى
اذاننا وقر و من بيننا و بينك حجاب فاعمل
انا عملون ○ قل انما انا بشر مثلكم يوحى
الى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه
واستغفروه وويل للمشركين ○

(অর্থ :—"এবং তাহারা বলে, যে জিনিষের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহা মানার ব্যাপারে আমাদের হৃদয় আবরণআচ্ছাদিত (অর্থাৎ উহা আমাদের হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না) এবং আমাদের কর্ণে বধিরতা আছে (যাহার দরুন আমরা তোমার কথা শুনিতেই পাই না) এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি পর্দা রহিয়াছে। অতএব তুমি (তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী) কাজ কর। আমরা (আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) কাজ করিব। তুমি বলিয়া দাও, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী করা হয় যে, তোমাদের কেবল এক খোদা আছেন। অতএব তাঁহার খেয়াল করিয়া দৃঢ়তা দেখাও। এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক (যাহাতে পা পিছলাইয়া না যায়) এবং (স্মরণ রাখ যে) মোশরেকদের জন্য আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।"—অনুবাদক)

অতঃপর বলেন :—

আমি যে ধারাবাহিক খোৎবা প্রদান করিতেছি ঐগুলিতে পাকিস্তানের তরফ হইতে প্রকাশিত শ্বেত-পত্রের উত্তর দেওয়া হইতেছে। আজিকার খোৎবার জন্যও আমি উক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া শ্বেতপত্রের কতিপয় আপত্তি বাছিয়া লইয়াছি এবং আজিকার খোৎবায় ঐগুলির উত্তর প্রদান করিব।

আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের একটি আপত্তি হইল এই যে :—"মির্যা সাহেবের এক অদ্ভুত দাবী এই যে তাঁহার আধ্যাত্মিক পদমর্য্যাদা অন্যান্য নবীগণের চাইতে অধিক উচ্চ। তাঁহার এই জাতীয় দাবীর উদাহরণ পেশ করার জন্য আমরা (পাকিস্তান সরকার) মির্য্যা সাহেবের লেখা হইতে কোন কোন উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি।"

"খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে মসীহ মওউদকে প্রেরণ করিয়াছেন (ইহা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সাল্লামের লেখা). যিনি তাঁহার পূর্বের মসীহ হইতে স্বীয় পদ মর্য্যাদায় অনেক বেশী উচ্চ। যাঁহার হস্তে আমার জীবন রহিয়াছে আমি ঐ সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি যে, যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে আসিতেন তাহাহইলে যে সকল কার্য্য আমি সম্পাদন করিতে পারি কখনো তিনি ঐগুলি সম্পাদন করিতে পারিতেন না এবং যে সকল নিদর্শন আমার নিকট হইতে প্রকাশিত হইতেছে কখনো তিনি ঐগুলি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না।" (হকিকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ১৫৩)।

অতঃপর পাকিস্তান সরকার হকিকাতুল ওহীর ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত পরিশিষ্টের একটি উদ্ধৃতি পেশ করে এবং এই উদ্ধৃতিটিকেও তাহারা আপত্তির লক্ষ্যবস্তু বানাইয়াছে :—

"পৃথিবীতে এমন কোন নবী আগমন করেন নাই যাঁহার নাম আমাকে দেওয়া হয় নাই। অতএব 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' খোদা বলেন যে, আমি আদম (আঃ), আমি নূহ (আঃ), আমি ইব্রাহীম (আঃ), আমি ইসহাক (আঃ), আমি ইসমাইল (আঃ), আমি মূসা (আঃ), আমি দাউদ (আঃ), আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ), আমি মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—অর্থাৎ বুরুজীভাবে (প্রতিচ্ছায়া রূপে) খোদা এই পুস্তকে এই সকল নাম আমাকে দিয়াছেন এবং আমাকে 'জরীউল্লাহ কি হুলুলল আম্বীয়া' (সকল নবীর ভূষনে আল্লাহর বীর) বলিয়াছেন। অর্থাৎ খোদার রসুল সকল নবীগণের ভূষনে। অতএব ইহা জরুরী যে, প্রত্যেক নবীর মর্যাদা আমার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতো।"

এই আপত্তি ছাড়াও পাকিস্তান সরকার অন্য একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে যে সেলসেলা আলীয়া আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম স্বীয় ওহীকে অন্যান্য নবীর ওহীর মত ওহী বলিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি আপত্তি একই প্রকারের আপত্তি। যদি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সকল নবীগণের শামিল হন, তাহাহইলে নবীগণ সম্বন্ধে কোরআন করীমে আমরা দুই প্রকারের আয়াত দেখিতে পাই। কোন কোন আয়াতেতো সকল নবীকে সমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন : كل امن بالله و ملا ئكته و كتبه و رسله لا نفرق بين احد من رسله —"আমরা রসুলগণের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করিনা।" এই দাবী হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার মান্যকারীদের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "ইহারাই রসুলগণ যাহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা কাহারো কাহারো উপর প্রাধান্য দান করিয়াছি।" অতএব যদি হযরত মসীহ মওউদ আলা ইহেস সালাতু ওয়াস সালাম নবীগণের শামিল হন তাহাহইলে এই দুইটি আয়াতের মধ্যে উপরোক্ত আপত্তি দুটির উত্তর মওজুদ রহিয়াছে। ওহীর ব্যাপারে রসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করা যায়না। সকল রসুলগণের প্রতি ঐ পবিত্র ওহীই খোদার নিকট হইতে অবতীর্ণ হয়, যাহা ইহার পূর্বের রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল অথবা ভবিষ্যতের রসুলগণের প্রতি অবতীর্ণ হইবে এবং খোদার পবিত্র কালামে ইহার (ওহীর) মর্যাদা, ইহার সম্মান, ইহার শক্তি এবং ইহার সত্যতার ব্যাপারে কোন তারতম্য করা হয় না। নবীগণের মান-মর্য্যাদার ব্যাপারে বলিতে হয় যে ইহা আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি যাহাকে চাহেন উচ্চ মর্য্যাদা দান করেন এবং যাহাকে চাহেন কম মর্য্যাদা দান করেন, এবং কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন। এখন কেবল

ইহাই দেখিতে হইবে যে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের যেই দাবী ছিল, ঐ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই দাবী করা সাজে কি সাজে না যে তাঁহাকে অতীতের কোন কোন নবীর উপর প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। তাঁহার দাবী সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, তিনি মসীহ হওয়ার দাবী করিয়াছেন এবং মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছেন এবং মাহদী ও মসীহ সম্বন্ধে উম্মতের অতীতের বুজুর্গগণ, ওলি-আল্লাগণ এবং যুগের মোজাদ্দেদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, মসীহ ও মাহদীর মোকাম (পদ-মর্য্যাদা) উম্মতের কোন সাধারণ মানুষের মোকাম হইবে না। বরং কেহ কেহতো সুস্পষ্ট রূপে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি (হযরত মসীহ ও মাহদী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম) অতীতের কোন কোন নবীর চাইতেও শ্রেয়ঃ হইবেন। পক্ষান্তরে যদি আমরা ইমাম মাহদী ও মসীহের কথা ছাড়িয়াও দেই তবুও উম্মতের মধ্যে এইরূপ বুজুর্গও সৃষ্টি হইয়াছেন, যাঁহারা ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীও করেন নাই, মসীহ্ হওয়ার দাবীও করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে এইরূপ দাবীই করিয়াছেন। বরং ইহার চাইতেও অধিক দাবী করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ওহীর ব্যাপারে বলিতে হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে ওহীর কথা ঐভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যেইভাবে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের দাবীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের লোকদের উপর এবং সমগ্র মানবজাতির উপর ইমাম মাহদী ও মসীহর শ্রেষ্ঠতার দাবীর ব্যাপারে বলিতে হয় যে, এই দাবীর কথা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে একাধিক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ওহীর ব্যাপারেও দুইটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি। হযরত মহীউদ্দিন ইব্‌নে আরবী (রহঃ) কেবল ওহীর দাবীই করেন নাই বরং এই দাবীও করেন যে "আমার মেরাজ হইয়াছে এবং ইহাতে আমার উপর এই আয়াত নাযেল হইয়াছে ঃ—

قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسمعيل واسحق
ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق
بين احد منهم ونحن له مسلمون — فاعطانى فى هذه الاية كل الايات وقرب
على الامر وجعلها مفتاح كل علم فعلمت انى مجموع من ذكر لى

(আল্ ফতুহাতুল মক্কীয়া—তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা—৩৫০)

অনুবাদ—"বলা হইয়াছে, তুমি বলিয়া দাও যে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি এবং উহার উপর, যাহা আমাদের নিকট নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা নাযেল করা হইয়াছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁহার সন্তানদের উপর এবং মূসা, ঈসা ও সকল নবীগণকে তাঁহাদের রাবের তরফ হইতে যাহা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা কাহারো সহিত কাহারো তারতম্য করিনা এবং আমরা খোদার জন্য পরিপূর্ণরূপে বিশ্বস্ত।"

অতঃপর তিনি (হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরবী) বলেনঃ—

"অতএব এই আয়াতে তিনি আমাকে সকল নিদর্শন দান করিয়াছেন এবং আমার জন্য আধ্যাত্মিক বিষয়কে নিকটতর করিয়া দিয়াছেন ও তিনি এই আয়াতকে আমার জন্য সকল জ্ঞানের চাবি বানাইয়া দিয়াছেন। অতএব আমি জানিয়া গিয়াছি যে আমি এই সকল নবীর সমষ্টি ও সমাবেশ, যাহাদের উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে।"

হযরত খাজা মীর দর্দ দেহলবীও (রহঃ) তাঁহার 'ইলমুল কেতাব' গ্রন্থে 'তাহাদিসে নেয়ামত' শিরোনামে ইলহামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ইলহাম নিজ পদ-মর্য্যাদায় পূর্বের ইলহামের মর্য্যাদা রাখে। কেননা কোরআন করীমের আয়াতের আকারে তাঁহার নিকটও ইলহাম হইয়াছিল। বস্তুতঃ একটি ইলহাম এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে ঃ— "ولا تتبع اهواءهم واستقم كما امرت"

অতঃপর তিনি বলেন, আরো একটি ইলহাম হইয়াছে ঃ— "أفحكم الجاهلية يبغون فى

"ز مان ير جم الله با يات ما يشاء" অতঃপর আর একটি ইলহাম হইল ঃ—

"ان تعذ بهم فا نهم عبا دك و ان تغفر لهم فا نك انت العزيز الحكيم"

হযরত মসীহর চাইতে শ্রেয়ঃ হওয়ার ব্যাপারে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম ইহার হিকমতও নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন এবং হিকমত এই ধরণের যে, আজও কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ, যে ইসলামের উপর ঈমান রাখে, সে এই হিকমাত সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেনা। সে ঈমান হারানো ব্যতীত কোন আপত্তি করিতে পারেনা। বস্তুতঃ যেই দলিল তিনি কায়েম করিয়াছেন উহা এই যে ঃ—

"এইখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সংস্কারের জন্য আমার উপর একটি খেদমতের দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে, কেননা আমাদের আকাও প্রভু সমগ্র বিশ্বের জন্য আসিয়াছিলেন, সেইহেতু এই আজিমুশশান খেদমতের জন্য আমাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ দান করা হইয়াছে, যাহা এই বোঝা উত্তোলন করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আমাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান এবং নিদর্শনও দান করা হইয়াছে, যাহা 'ইত্মামে হুজ্জতের' (পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনের সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠা করার) জন্য সময়োপযোগী ছিল। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-কে উক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শন দান করা জরুরী ছিলনা। কেননা ঐ সময় ইহার প্রয়োজন ছিলনা। এইজন্য হযরত ঈসাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ দান করা হইয়াছিল, যাহা ইহুদীদের একটি ক্ষুদ্র দলের সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি কোরআন শরীফের উত্তরাধিকারী, যাহার শিক্ষার মধ্যে সকল পরিপূর্ণতার সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং যাহা সমগ্র বিশ্বের জন্য। কিন্তু হযরত ঈসা কেবলমাত্র তওরাতের উত্তরাধিকারী ছিলেন, যাহার শিক্ষা অপূর্ণ ছিল এবং যাহা একটি জাতির জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই কারণে বাইবেলে তাঁহাকে ঐ সকল কথা তাকিদের সহিত বলিতে হইয়াছে যাহা তওরাতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু কোরআন মজিদ হইতে আমি আমি কোন অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনা করিতে পারিনা। কেননা ইহার শিক্ষা সর্বশেষ শিক্ষা ও পরিপূর্ণ শিক্ষা এবং তওরাতের মত কোন বাইবেলের উপর নির্ভরশীল নয়"।

অন্যান্য বুজুর্গাণের দাবীর ব্যাপারে বলিতে হয় যে, হযরত আলী রাজীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন এবং এই উদ্ধৃতি আমি শেখ দাউদ বিন মাহমুদুল কায়সরীর পুস্তক সুসুল হিকাম' হইতে গ্রহণ করিতেছি—ইহার ভূমিকায় তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতি আরোপ করিয়া লেখেন যে, তিনি বলেন যে ঃ—

"انا نقطة باء بسم الله انا جنب الله الذى فرتم فيه و انا القلم

و انا اللوح المحفوظ و انا العرش و انا الكرسى و انا السموت السبع

و الارضون" (মকদ্দমা-পৃষ্ঠা ১৩২, অধ্যায়—৮)

অর্থাৎ "হযরত আলী এই দাবী করেন যে, আমি 'বিসমিল্লাহ' এর 'ব' বিন্দু, আমি খোদার ঐ দিক, যাহার ব্যাপারে তোমরা উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়াছ, আমি কলম, আমি 'লওহে মাহফুজ', আমি কুরসী এবং আমি সাত আসমান ও জমীন।"

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ), যিনি শিয়া সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ ইমাম এবং যিনি হযরত ইমাম আবু হানিফার শিষ্যও ছিলেন, তিনি ইমাম মাহদীর প্রতি আরোপ করিয়া ভবিষ্যৎবাণীরূপে এই কথা বলেন যে, "যখন ইমাম মাহদী আগমন করিবেন তখন তিনি এই দাবী করিবেন ঃ— "হে সমগ্র মানবমন্ডলী! শ্রবন কর। যাহারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে ও ইসমাইল (আঃ)-কে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে, ঐ ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) আমি এবং যাহারা মুসা (আঃ) ও ইউশা (আঃ)-কে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে, ঐ মুসা (আঃ) ও ইউশা (আঃ) আমি এবং যাহারা ঈসা (আঃ) ও শমউন (আঃ) কে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে, ঐ ঈসা (আঃ) ও শমউন (আঃ) আমি এবং যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও আমিরুল মোমেনীনকে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে, সেই মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও আমীরুল মোমেনীন আমি এবং যাহারা হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) কে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে, ঐ হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) আমি এবং যাহারা হুসাইন (রাঃ) এর বংশের ভবিষ্যৎ ইমামগণকে দেখিতে চায় তাহারা স্মরণ রাখুক যে ঐ সকল ইমাম আমি।"

অতএব পাকিস্তান সরকার হযরত মসীহ মওউদ আলাহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই সকল উদ্ধৃতি পেশ করিয়া আহমদীয়াতের সমর্থনে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যতার দলিল হিসাবে এই দলিল পেশ করিয়াছে যে, ইমাম মাহদীর যদি এত সব পদমর্য্যাদা থাকে এবং অতীতের বুজুর্গগণ যখন এত সব ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাহইলে সত্য ইমামের জন্য জরুরী যে তিনি এই সকল দাবী করিবেন। যদি তিনি ইমাম হওয়ার দাবী করিতেন, কিন্তু উপরোক্ত দাবীগুলি না করিতেন তাহাহইলে তিনি কি সত্যবাদী বলিয়া সাব্যস্ত হইতেন ? না মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইতেন ? অন্যথা এই সকল ইমাম, যাহারা উপরোক্ত ভবিষ্যৎবণী করিয়াছেন, তাহারা মিথ্যাবাদী ? দুইটির মধ্যে একটিকে তোমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে, যেইভাবে হযরত ইমাম জাফর সাদেকের নেকী ও বুজুর্গী স্বীকার করিতে হয়। যদি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে উপরোক্ত দাবীর দরুন মিথ্যাবাদী বল, তাহাহইলে হযরত ইমাম জাফর সাদেকের সত্যতা ও বুজুর্গীকে অস্বীকার করাও জরুরী হইয়া পড়িবে। কিন্তু দাবীর এই ধারাবাহিকতা এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই।

ইমাম খোমেনী সাহেব, যিনি বর্ত্তমান শীয়া ইমাম বা নায়েবে ইমামের পদমর্য্যাদার অধিকারী তিনিতো ইমাম মাহদীর সম্বন্ধে নয়, বরং শীয়া ইমামদের সম্বন্ধে এবং সাধারণ শীয়া ইমামদের সম্বন্ধে এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে:—

"নিঃসন্দেহে আমাদের ধর্মের জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে ইহাও একটি বিষয় যে, ইমামদের মোকাম পর্য্যন্ত কোন সম্মানিত ফেরেশতা ও পৌঁছায় নাই, এবং কোন নবী ও রসুল ও পৌঁছান নাই।" (বেলয়েতুল ফকিহে বিল হুকুমাতিল ইসলামীয়া—পৃষ্ঠা ৩৫)। হযরত শেখ আবদুল কাদের সাহেব জিলানী (রহঃ) তো মসীহ হওয়ার দাবীও করেন নাই এবংমাহদী হওয়ার দাবীও করেন নাই। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বুজুর্গগণকে খোদা যে উচ্চ পদমর্য্যাদা দান করিয়াছেন উহা এতই আজিমুশশান যে, আজকালকার তত্ত্বজ্ঞানহিন ও বাহ্যদর্শী আলেমরা উহা ধারণাও করিতে পারেনা। হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর সম্বন্ধে শেখ নুরুদ্দীন সাহেব আবুল হোসেন আলী বিন ইউসুফ স্বীয় পুস্তক "বাহজাতুল আসরার" এর ২১ পৃষ্ঠায় লেখেন যে, হযরত শেখ আবদুল কাদের সাহেব (রহঃ) বলেন :

"لا انس لهم مشا ئخ و الجن لهم مشا ئخ و الملا ئكة لهم مشا ئخ و انا شيخ الكل"

অতঃপর তিনি বলেন :— "لا تقيسونى باحد و لا تقيسوا على احدا"

যে, "মানুষের গুরু থাকে এবং জিনদেরও গুরু থাকে ও ফেরেশতাদেরও গুরু থাকে। কিন্তু আমি সকলের (মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের) গুরু। আমাকে কাহারো উপর ভাবিওনা এবং কাহাকেও আমার উপর ভাবিওনা।"

নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব ইমাম ইবনে সিরিনের নিম্নরূপ বক্তব্য তাঁহার পুস্তক 'হুজাজুল কেরামা' এর ২৮৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন :—(অনুবাদ)—"তিনি বলেন যে, এই উম্মতের মধ্যে এইরূপ একজন খলিফা হইবেন, যিনি আবু বকর এবং উমর হইতেও উত্তম হইবেন। তাহাকে জিজ্ঞসা করা হইল যে, তিনি কি এই দুইজন হইতেও উত্তম হইবেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, হাঁ, তিনি কোন কোন নবী হইতেও শ্রেয়ঃ হইবেন। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবু বকর ও উমর এই খলিফা (—হযরত ইমাম মাহদী) হইতে শ্রেয়ঃ হইবেন না। ইমাম সিয়ুতি এই বক্তব্যের সনদকে সঠিক বলিয়াছেন।"

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবীর (রহঃ) নাম বড়ই সম্মানের সহিত এই পুস্তিকায় (পাকিস্তান সরকারের শ্বেত পত্রে), যাহা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যাহাকে একটি বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং যাহাকে একটি আজীমুশশান দর্শন বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তিনি (হযরত শাহ্ অলী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী) উম্মতের মসলা মসায়েল খুব ভাল করিয়া জানতেন। আগমনকারী মসীহ মওউদের মোকাম সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"অর্থাৎ মসীহ মওউদের হক আছে যে তাঁহার মধ্যে সৈয়্যাদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূর (জ্যোতি) প্রতিফলিত হইবে। সাধারন লোকেরা মনে করে যে, যখন মসীহ মওউদ অবতীর্ণ হইবেন তখন তিনি কেবলমাত্র একজন উম্মত হইবেন। এইরূপ কথনো নয়। বরং তিনি 'ইসমে জামে মোহাম্মদী' (সকল নবীগণের নাম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে) এর ব্যাখ্যা হইবেন এবং তাঁহার সঠিক ও হুবহু নকল (True Copy) হইবেন। অতএব কোথায় তিনি (মসীহ মওউদ) এবং কোথায় কেবলমাত্র একজন উম্মতী !!" (আল খাইরুল কাসীর, পৃষ্ঠা-২৩৬ এবং ২৩৭)।

হযরত ইমাম আবদুর রাজ্জাক কাশানী (রহঃ) "শরাহ আল্ কাশানী আলা খসুসিল হিকাম" পুস্তকে বলেন যে, মাহদী আখেরুজ্জামান শরিয়তের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অধীন হইবেন :—

(অনুবাদ)—"অর্থাৎ মাহদী আখেরুজ্জামান শরিয়তের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অধীন হইবেন। কিন্তু জ্ঞান-মারেফতের ক্ষেত্রে সকল নবী ও অলিগণ তাঁহার অধীন হইবেন। কেননা তাঁহার বাতেন (অভ্যন্তরীণ গঠন) মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাতেন হইবে" (শরাহ্ আল-কাশানী আলা খসুসিল হিকাম, পৃষ্ঠা ২৫)।

অতঃপর হযরত শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) বলেন :—

(অনুবাদ)—"অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়ারূপ সত্ত্বার একটি প্রকার এই যে, কখনো এক ব্যক্তির সত্ত্বায় তাঁহার বংশধর এবং তাঁহার সহিত যাহারা সম্বন্ধ রাখে তাহারা প্রবেশ করিয়া থাকে, যেমন কিনা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত মাহদীর সম্পর্কে অনুরূপ প্রতিচ্ছায়ারূপ সত্ত্বা প্রকাশিত হইবে।"

ইহাও একটি আপত্তি যে, তাঁহাকে (হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বুরুজ (প্রতিচ্ছায়া) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার সর্বজন স্বীকৃত বুজুর্গগণ দিব্য দর্শন লাভকারী ও ইলহামলাভকারী বুজুর্গগণ এবং এইরূপ বুজুর্গগণ, যাঁহারা নিজেদের যুগের কুতুব অথবা মোজাদ্দেদ ছিলেন, যাঁহাদিগকে উম্মতের মধ্যে এইরূপ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহাদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠেনা বরং আজ যাঁহাদের জুতা বহন করার যোগ্যও আপনাদের কোন আলেম দৃষ্টিগোচর হয়না, এই সকল উক্তি (ইমাম মাহদী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সম্বন্ধে) তাঁহাদের। অতএব এখন ফয়সালার জন্য দুইটি বিষয় আছে। ঐ ছুরি দ্বারা তাঁহাদিগকে জবেহ করার সাহস কর। অথবা ঐ মোহর দ্বারা তাঁহাদের উপরও কুফরের ফতুয়া লাগাও, যেইভাবে তোমরা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের উপর কুফরের ফতুয়া লাগাইয়াছ। যদি তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার ও খোদা-ভীতি থাকে তাহাহইলে পূর্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে ঐগুলির উপরও ছুরি চালাও। কেবল মাত্র ইহাই নহে। তোমরাতো হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই সকল দাবীর দরুন তাঁহার সকল মান্যকারীদিগকও হত্যার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছ। তোমরা এই ফয়সালা দিয়াছ যে, ইহা বৈধ যে এখন ইহাদের (আহমদীদের) ঘর লুট করা হউক, ইহাদের জিনিষ-পত্রে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হউক, ইহাদের সঞ্চয়কে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হউক, ইহাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে ইহাদের চোখের সম্মুখে হত্যা করা হউক এবং যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আগে জীবিত থাকে তাহা হইলে ইহাদের পিতামাতাকে ইহাদের সম্মুখে হত্যা করা হউক। এই সবই বৈধ। কেননা ইহাদের ইমাম এই সকল দাবী করিয়াছে। অতএব তোমার পূর্বের ইমামদিগের মান্যকারীদের সহিতও এই আচরণই কর। কিন্তু না, তোমাদের ক্ষমতা নাই। তোমাদের মধ্যে খোদা-ভীতি নাই! কেবল গলাবাজী করার ক্ষমতাই তোমাদের আছে। ইহার চাইতে অধিক কোন ক্ষমতাই তোমাদের নাই। সহজ সরল কথা এই যে আমি যেই সকল বুজুর্গের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইমাম মাহদী সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ববাদী-সম্মত বিশ্বাস এই যে তাঁহার (ইমাম মাহদী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের) এই মোকাম হইবে। তিনি এই সকল কথা বলিবেন। অতএব ইমাম মাহদীর দাবীকারকের জন্য এই সকল দাবী করা জরুরী। ইহা কি তাঁহার সত্যতার পরিচয়, না মিথ্যাবাদী হওয়ার পরিচয়? যদি তিনি মাহদীর দাবী করিতেন এবং এই সকল দাবী না করিতেন, তাহাহইলে তোমরাই উঠিয়া দাঁড়াইতে এবং তোমরাই তাঁহাকে অভিশপ্ত ঘোষণা করিতে। যদি তিনি এই সকল দাবী না করিতেন, তাহাহইলে তোমরা তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী বলিতে। কেননা পূর্বেকার ইমামগণ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

(সাপ্তাহিক 'বদর'—২৩শে মে ১৯৮৫ ইং)

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভূঁইয়া**

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি

(জুম্‌য়ার খোৎবার সারসংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[২৫শে জুন '৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা কাহ্‌ফের ৫৫—৫৯ নং আয়াত সমুহ তেলাওয়াত করেন। আয়াতসমূহের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল : (—অনুবাদক)।

"এবং আমরা এই কুরআনে প্রতিটি জরুরী বিষয় বিভিন্ন ধারায় বহুলাকারে বর্ণনা করেছি এবং (এরূপ এজন্যই করা হয়েছে যে) মানুষ বড়ই ঝগড়াটে।

এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়েত উপস্থিত হলো তখন (উহার উপর) ঈমান আনয়নে এবং তাদের রব্বের নিকট মাগফেরাত কামনায় তাদেরকে এ ছাড়া আর অন্য কিছুই বাধা দান করে নাই যে পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা যেন তাদের উপরও আসে অথবা আযাব যেন তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

এবং আমরা রসুলদেরকে শুধু সুসংবাদাতা এবং (আযাবের অগমন সম্বন্ধ) সতর্ক-কারী হিসাবেই প্রেরণ করে থাকি এবং যারা অস্বীকারকারী হয় তারা সত্যকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যার সাহায্যে কলহ করে থাকে ; এবং তারা আমার নিদর্শন সমূহ ও আমার হোশিয়ারীকে হাসি-বিদ্রুপের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে।

এবং তার চেয়ে বেশী জালেম আর কে হতে পারে যাকে তার রব্বের নিদর্শনা-বলীর দ্বারা বোঝানো সত্বেও সেগুলির প্রতি সে পৃষ্ঠ প্রদর্শ করে এবং তার দুই হস্তের দ্বারা অগ্রে প্রেরিত কর্মকে সে বিস্মৃত হয় ? নিশ্চয়ই আমরা তাদের হৃদয়কে বহু আবরণে আচ্ছন্ন করেছি যাতে তারা (সত্যকে) বুঝে উঠতে না পারে এবং তাদের কর্ণের উপরে বোঝা রেখে দিয়েছি। এবং তুমি যদি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করো, তাহলে (তারা যেহেতু এতই হিংসা রাখে সেহেতু এমতাবস্থায়) তারা সে হেদায়তকে আদৌ গ্রহণ করবে না।

এবং তোমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অগাধ রহমত ও করুণার অধিকারী ; তিনি যদি তাদের (মন্দ) কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাইতেন তা'হলে তাৎক্ষণিকভাবেই তাদের উপর আযাব নাযেল করতে পারতেন (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না) বরং তাদের জন্য একটি মেয়াদ (সময়সীমা) নির্ধারিত আছে। উহার পূর্বে (অর্থাৎ সেই আযাব ভোগ না করা পর্যন্ত) তারা কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

তারপর হুজুর আকদাস (অইঃ) বলেন : কথিত আছে যে, ইতিহাস উহার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কথাটি জাগতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে হয়তো বা শতকরা একশ ভাগ প্রজোয্য নাও হতে পারে কিন্তু কুরআন শরীফ থেকে যে ধর্মীয় ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় উহা অবশ্য অবশ্যই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, উহা পুনর্ঘটিত হয়। উল্লিখিত আয়াতগুলিতে যে ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে উহা যেমন বেদনাদায়ক এবং ভয়াবহ, তেমনি উহাতে সুসংবাদ সমূহও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতগুলির প্রাঞ্জল তরজমা ও প্রাণবন্ত তফসীর বর্ণনা করে হুজুর বলেন যে, মানুষের জন্য শিক্ষনীয় এমন কোন কথা নাই যা কুরআন করীমে বহুলাকারে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

খোদাতায়ালা যেহেতু বড়ই মাগফিরাতকারী (ক্ষমাশীল) এবং রহমত নাযেলকারী অত্যন্ত দয়াল খোদা সেজন্য তিনি আযাব শীঘ্রই নাযেল করেন না। সেই কারণেই কোন কোন লোক (অধৈর্য হয়ে) বলতে আরম্ভ করে দেয় যে, অস্বীকারকারীরা খোদার প্রিয় বান্দাদেরকে দুঃখ-যাতনা দেয় এবং অত্যন্ত অশ্লিল গালিগালাজ করে তথাপি খোদাতায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করেন না! হুজুর বলেন, এমনটি হয় এজন্যই যে, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দেন, যাতে তারা বিরত হয়। অন্যথা তাদের জন্য অবশ্যই একটি দিন নির্ধারিত আছে। যদি তারা বিরত না হয়, তাহলে সেদিনের আযাবে তারা নিপতিত হবে।

এই সেই ইতিহাস, যা কিনা আজ পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।!

হুজুর বলেন, আজকের খোৎবায় আমি সময়োপযোগী কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ ভিত্তিক আয়াত নির্বাচন করেছি। সুতরাং সুরা আল-আনআমের ৯২ নং আয়াত :

وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ○

এর তফসীর ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর বলেন, নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা সর্বদা বলে থাকে যে, আল্লাহতায়ালা কোন মানুষের উপর কালাম নাযেল করেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালার উপর বাধা-নিষেধ আরোপকারী তারা কে ?!

যেহেতু একথা আহ্‌লে কিতাবকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সেজন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর যদি আল্লাহতায়ালা কালাম নাযেল করতে না পারেন, তাহলে মুসা (আঃ)-এর উপর যে কিতাব নাযেল হয়েছিল উহা কে নাযেল করেছিল ? অতএব, যখন তোমরা পূর্ববর্তী কালামকে স্বীকার করে নিয়েছ, এমতাবস্থায় এখন তোমরা এই নুতন কালামকে কেন মান না ? বস্তুতঃ ইহার কারণ এই যে, তোমরা সেই কালামকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছ। কিতাব একটি হওয়া সত্বেও তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছ এবং

প্রতিটি ফের্কা নিজেদের জন্য কিছু কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশাবলী থেকে গাফিল হয়ে গেছে। ইহার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছে যে তারা নিজেরাও টুকরা টুকরা হয়ে পড়েছে।

تبدونها وتخفون كثيرا —আয়াতাংশে তাদের একটা বক্রতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে তারা প্রত্যেকেই কিতাবের মাত্র কোন কোন অংশকে প্রকাশ করে। কিন্তু অধিকাংশকেই গোপন করে দেয়। যে অল্প কিছু অংশ তাদের পছন্দসই হয় তাই তারা গ্রহণ করে নেয়, আর শুধু উহাকেই প্রকাশ করে, এবং যা তাদের পছন্দসই হয় না, তা তারা গোপন করে, উহাকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেয়। এই অবস্থাই আজ মুসলমানদের বেলায়ও দেখা যাচ্ছে যে, কুরআন করীমের যাবতীয় সত্যগুলির মধ্য থেকে কিছু মাত্র কিছু সত্য প্রত্যেক ফের্কার নিকটই আছে কিন্তু ইহার মোকাবেলায় কুসংস্কারের পরিধিই অধিক বেড়ে গেছে এবং আকায়েদ বিকৃত হয়ে পড়েছে। যেমন, 'খাতামানবীয়ীন' সম্বলিত আয়াত তো সর্বদা তারা পেশ করে কিন্তু সূরা নেসার আয়াত নং ৭০ :— انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين সম্বলিত আয়াতটি একেবারেই প্রকাশ করে না। (পূর্ণ আয়াতটির তরজমা নিম্নরূপ : "এবং যারা আল্লাহ এবং এই রসুলের অনুবর্তীতা করবে তারা ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ হিসাবে ; এবং এরা (অর্থাৎ এই চারি শ্রেণীর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা) হলো পরস্পর উত্তম সাথী।" —অনুবাদক)।

অতএব, আলোচ্য আয়াতটিতে বিস্তারিতভাবে জাতির নকসা চিত্রিত করা হয়েছে। হুজুর বলেন যে, তারা শুধু কুরআনী আয়াতের সহিতই নয় বরং হাদীসাবলীর সহিতও এই একই ব্যবহার করে থাকে। যেমন, ত্রিশ দাজ্জাল সম্বলিত হাদিসটি তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে কিন্তু বাকী হাদিস সমূহ, যেগুলিতে উক্ত বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে এবং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতায় কুরআনী শরীয়তের অধীন নবী আসতে পারে এমন সব হাদিসকে তারা গোপন করে।

হুজুর বলেন, দাজ্জাল মিথ্যাবাদী এবং شرير অর্থাৎ দুষ্কৃতকারী ও ফেৎনাকারীকে বলা হয় এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,

علماء هم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج وفيهم تعود

(—"শেষ যুগে আলেমগণ হবে আকাশের নীচে নিকৃষ্ট ধরণের দুষ্কৃতকারী। ফেৎনা-ফসাদ তাদের থেকেই জন্ম নিবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে যাবে।"—মেশকাত কেতাবুল ইল্‌ম এবং কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩৮৫ দ্রষ্টব্য —অনুবাদক)।

তেমনি ('কানযুল উম্মাল' ৭ম খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) অপর একটি হাদিস—যাতে বলা হয়েছে যে, "মানুষ যখন ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করার জন্য আলেমদের কাছে যাবে তখন তারা দেখতে

পাবে যে তাদের আলেমরা হচ্ছে বানর ('কিরাদাতান') এবং শুকর ('খানাযীরা')।" সুতরাং উক্ত হাদিসগুলির মূল কুরআন করীমের যে সকল আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে সে আয়াত-গুলিকেও তারা লুকায়। বস্তুতঃ شر من تحت اديم السماء হাদিসটির মূল নিহিত রয়েছে সূরা আনফালের ২৩ ও ৫৬ নং আয়াত দু'টিতে যথা :—

ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ٥

(অর্থাৎ—আল্লাহর নিকট ওরাই হায়ওয়ানদের চাইতেও নিকৃষ্ট যারা হলো এমন বধির ও মূক তারা কিছুই বুঝিতে চায় না।" আয়াত নং ২৩)

ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون

(অর্থাৎ—"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট প্রাণী হলো ঐ সকল লোক যারা (আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে) অস্বীকার করেছে, তারা ঈমান আনে না।" আয়াত নং ৫৬)

তেমনি قردة (বানর) এবং خنازير (শুকর) সম্পর্কিত হাদিসটির মূলভিত্তিও নিহিত রয়েছে নিম্নরূপ আয়াতটিতে :—

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت - اولئك شر مكانا و اضل عن سواء السبيل ٥ (সূরা আল-মায়েদা : আয়াত ৬১)

(অর্থাৎ—"তুমি বলে দাও যে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ সকল লোকের অবস্থা জানাব, যাদের প্রতিফল তার চাইতেও নিকৃষ্ট (যাকে তোমরা অপছন্দ করে থাক) ? তারা হলো ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন ও যাদের উপর (তাঁর) গজব পতিত হয়েছে এবং যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বানর ও শুকরানুরূপ করেছেন এবং যারা সীমালংঘনকারীদের দাসত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। এদের অবস্থান হলো নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতিপূর্ণ এবং তারা সোজা পথ থেকে চরমপর্যায়ে বিভ্রান্ত।" —অনুবাদক)। অন্য কথায়, উক্ত আয়াতগুলির আলোকেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন যে এ সকল ফেতনা……আলেমদের পক্ষ থেকেই সৃষ্টি করা হবে।

মোট কথা, যে সকল কার্যকলাপ পূর্ববর্তী জাতিরা করেছিল সেগুলিই বর্তমান যুগে এই শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

হুজুর বলেন, আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে…….. ان الذين يكفرون بالله و رسله —সূরা নেসার ১৫১—১৫২ নং আয়াত দু'টিতে এবং ইহা ইতিহাসের এরূপ একটি দিক, যা এমনি ধারায় সংঘটিত হয়ে চলে আসছে এবং বারবারই প্রকাশিত হতে থাকে। ইহাতে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব হলো এই যে নবীদের মধ্যে তো পার্থক্য করা যায় না কিন্তু তারা

নবীগণ এবং খোদার মধ্যে পার্থক্যকারী হয়ে দাঁড়ায় এই বলে যে, আল্লাহতায়ালা এই ব্যক্তিকে কেন এত উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা দান করলেন এবং তার উপরে কেনই বা কালাম নাযেল করলেন? এই অবস্থাটিও আজ আমরা জাতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزءون

(সুরা হিজর ১৭ নং আয়াত)

অর্থাৎ—"দুনিয়াবাসীদের সর্বদা এ নিয়মই চলে আসছে যে রসুলদের প্রতি বিদ্রূপ ছাড়া তারা আর কিছুই করে না।" হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিও তারা বিদ্রূপই করছে। এমন কি হিন্দুরা, আর্যরা এবং খৃষ্টানরা যে ধরণের যত পরিমাণ বিদ্রূপ আঁ-হযরত (সাঃ) এবং কুরআন করীমের প্রতি করেছে, এরা ওসব কিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। এ দিক থেকেও ইতিহাস পুনর্ঘটিত হয়ে চলেছে।

হুজুর বলেন, এরা এমন ধরণের লোক এবং এরা ঐ সকল লোকেরই শ্রেণীভুক্ত, যারা অনিবার্যরূপে নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, যাদের স্বভাবের মধ্যেই অস্বীকার নিহিত থাকে। যেমন, কুরআন শরীফে ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات (সুরা মুমেন: ৩৫ নংআয়াত) আয়াতটিতে আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেছেন।

হুজুর বলেন, قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا..... —সুরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতটির সম্বন্ধে আমি কোন পরবর্তী খোৎবায় আলোকপাত করবো।

হুজুর বলেন,

আহ্‌বাবে-জামাতকে আমি এ কথা বলতে চাই যে, এ বিষয়গুলি আমি এ উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করছি যাতে তাঁদের ঈমান অধিকতর শক্তি লাভ করে। আমরা এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি যেখানে দলিল (শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ) কর্ম-জগতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে.....। অতএব, কুরআন করীম অধ্যয়নের আলোকে আমি এখন যে চিত্র তুলে ধরেছি তা অতি সুস্পষ্ট এবং আপনাদের আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। আপনাদের যে কোন বিরুদ্ধবাদী শুনতে পাবে, তাকে অবশ্যই ইহা স্বীকার করতে হবে যে আহমদীয়তের উপর তাদের যাবতীয় আপত্তি এবং তারা যে সব কার্যকলাপ করে বেড়াচ্ছে সে সবই করআন করীম ব্যক্ত করবে এবং পবিত্র করআনের এ সকল বর্ণনার দ্বারা আহমদীয়তের শত্রুদের সবিস্তারে পরিপূর্ণ চিত্রাঙ্কন হবে। তারপর আহমদীয়া জামাতেরও যে চিত্র ফুটে উঠছে, তাও কুরআন করীম সংরক্ষিত করে দিয়েছে। পরবর্তীতে উহারও উল্লেখ করবো, ইনশাআল্লাহ।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আল-নস্‌র", ২৮শে জুন '৮৫)

জুময়ার খোৎবা (সার সংক্ষেপ)

[৫ই জুলাই '৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, ও তায়াউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা মায়েদার ৬০ নং আয়াত তেলওয়াত করেন। আয়াতটি তরজমা সহ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون ٥

"তুমি বলে দাও হে কিতাবধারীগণ! তোমরা আমাদের প্রতি একমাত্র এজন্যই দোষারোপ কর এবং বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং যে কালাম আমাদের উপর নাযেল হয়েছে এবং যে কালাম ইহার পূর্বে নাযেল করা হয়েছিল উহার উপরও ঈমান এনেছি এবং (তোমরা এ জন্যও আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ যে) তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য ও পাপাচারী।" (—অনুবাদক)।

এ আয়াতটির প্রাঞ্জল তরজমা পেশ করার পর হুজুর বলেন, কুরআন করীম এমনই একটি মহান ও আজিমুশ্বান কিতাব যে ইহা বিগত জাতিবর্গের 'আবরার' ও 'আশরার' অর্থাৎ সদাত্মা ও ও দুরাত্মা গণের ইতিহাস অতি উত্তম আকারে সংরক্ষিত করেছে এবং ভবিষ্যৎকালে আগমনকারী প্রতিটি জাতিও উহার মধ্যে নিজেদের ছবি দেখতে পারে।

হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার অথবা সমাগত নবীদের উপর ঈমান আনার কারণে মুমেনদের উপর বিপদ ও পরীক্ষা আসে—এমনটি তো প্রত্যেক যুগেই হয়ে এসেছে কিন্তু এমন কখনও হয় নাই যে, পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবের উপর ঈমান আনার কারণেও কখনও বিপদ এসেছিল। কুরআন করীমের নজুলের সময়ে এমন ঘটনা ঘটে নাই যে, বিরুদ্ধবাদীরা বলেছে যে, 'যেহেতু তোমরা আমাদের কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখ, সেজন্য আমরা তোমাদের বিরোধীতা করছি।" এমতাবস্থায় কুরআন করীম এ কথাটি কেন বললো যে ঃ—...هل تنقمون منا ..... وما انزل من قبل অর্থাৎ "আমরা আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রসুলদের উপরই নয় বরং তাঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের উপর ও ঈমান এনেছি বলে তোমরা আমাদের প্রতি কেন ক্ষুব্ধ ?"

হুজুর বলেন, প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমে তো কিয়ামতকাল অবধি সর্বকালের সার্বিক ইতিহাসকে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই যুগ। অতএব যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাথমিক যুগে উক্ত আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, সেহেতু পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত কোন না কোন যুগে এরূপ লোকের সৃষ্টি হওয়া জরুরী ছিল, যারা উক্ত আপত্তিটা উত্থাপন করতো। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর প্রথম যুগে তো ব্যাপার এমন ছিল যে বিরুদ্ধবাদীদের আকায়েদ থেকে ভিন্ন মত অবলম্বনে বরং তারা বিরাগ ভাজন হতো। যেমন, কুরআন করীম কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে যে, আহলে কিতাবরা (ইহুদীগণ) তাতে ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ধর্মকে তারা Monopoly অর্থাৎ একচাটিয়া অধিকারে পরিণত করে ছিল না। কিন্তু ধর্মকে মনোপলী করার ইতিহাস তো শুধু আজিকার মানুষেই রচনা করছে, যারা এজন্য ক্রোধে উত্তেজিত হচ্ছে যে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আহমদীরা কেন ইহার উপর ঈমান আনে। তারা বলে যে, আহমদীরা কলেমা পাঠ করতে পারবে না, তারা নিজেদের মসজিদগুলিকে মসজিদ বলতে পারবে না, ইত্যাদি। কত বিচিত্র

ব্যাপার যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে তো বিবাদ ছিল এই যে, (ইহুদীরা বলতো,) আমাদের কিবলা কেন ত্যাগ করলে? আর এখনকার বিবাদ হলো এই যে, আহমদীদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা আমাদের কেবলা কেন গ্রহণ করলে?

সুতরাং আমরা সৌভাগ্যশালী যে...هل تنقمون منا—আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি আমাদের উপরে পূর্ণ হচ্ছে।

আহমদীদের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের দাবীনামার উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের নাম বদলাবার জন্য আদালতে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পাঞ্জাব এসেম্বলীতে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে যে, "রাবওয়ার নাম পরিবর্তন করা হোক, কেননা রাবওয়া শব্দটি কুরআন করীমে পাওয়া যায়। অতএব, এই পবিত্র নামের সহিত এ সকল 'নাপাক' লোকের কোন সম্পর্ক ও সংশ্রব থাকতে পারে না।"

হুজুর বলেন, কুরআন করীমে তো ইবলিশ ও আবু লহাবের মত (অপবিত্র) নামও লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধিকন্তু 'মোহাম্মদ'—প্রিয় ও পবিত্র নামটি আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে অত্যন্ত প্রীতি ও ভালবাসার সহিত লিপিবদ্ধ করেছেন। আজ তাদের (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের) মধ্যে থেকে সকল প্রকার অন্যায় ও বদকারীতে লিপ্ত মানুষেরাও সেই পবিত্র (মোহাম্মদ) নামটি যে নিজেদের নাম হিসাবে ধারণ করে রেখেছে—সেদিকেও তাদের দৃষ্টি যায় না কেন?

আহমদীদের বেলায় তারা এ সব উদ্ভট বিষয়ের তো আপত্তি উত্থাপন করে, কিন্তু তারা ইহা দেখে না যে اكثرهم فاسقون (—"তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।")

হুজুর বলেন, কুরআন করীম এ বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করেছে ঃ

وترى كثيرا منهم يسارعون فى الاثم والعدوان واكلهم السحت - لبئس ما كانوا يصنعون ٥

(—"তুমি তাদের মধ্যে এরূপ বিপুল সংখ্যক লোক দেখতে পাবে যারা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘণে এবং হারামখোরীতে খুব অগ্রসরমান ; (বস্তুতঃ) যা কিছু তারা করে বেড়াচ্ছে তা অতি জঘন্য।" —অনুবাদক)।

অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাব প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে বাইবেলে বর্ণিত নেকীর কথাগুলি পালন করলে তো তোমাদের খারাপ বোধ হয় কিন্তু তোমরা নিজেরা ঐ সব কাজ করে বেড়াচ্ছ যেগুলি থেকে বাইবেল বারণ করে। বস্তুতঃ আজ বাইবেলের স্থলে কুরআন করীমের ক্ষেত্রেও একই আচরণ দৃশ্যমান। আজ প্রতিটি পত্র-পত্রিকাই তোমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সে চিত্রই তুলে ধরছে, যা ক্রমবৃদ্ধিহার ভয়ানক ও বিভৎস রূপ ধারণ করে চলেছে এবং মাল আত্মসাতের সম্ভাব্য সকল ধরণের কৌশলের কাহিনীর সবিস্তারে উল্লেখ ও প্রচার হয়ে চলছে।

হুজুর বলেন, কুরআন করীম আরো বর্ণনা করে যে, আলেমগণ যখন দলিল-প্রমাণের সহিত কথা বলতে অক্ষম ও অবদস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের আর উপায়ন্তর থাকে না তখন তারা ঘোষণা করে ঃ اقتلوه وحرقوه। —"তাকে হত্যা কর এবং অগ্নি দগ্ধ কর।"

হুজুর বলেন, যদিও এই দাবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে, তথাপি অবিকল একই দাবী জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধবাদীরা উত্থাপন করছে যে, "আমরা আহমদীদের বিরুদ্ধে অর্ডিনেন্সও তৈরী এবং জারী করে দিয়েছি কিন্তু এরা (আহমদীরা) অগ্রসারমান হয়েই চলেছে এবং সকল দিক থেকে উন্নতি করে যাচ্ছে।" অতএব তারা (বিরুদ্ধবাদীরা) আবার দাবী জানাচ্ছে যে, "এদেরকে আমাদের সুপর্দ কর যাতে আমরা এদেরকে কতল করে দেই।" কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ فانجاه الله من النار—"আল্লাহতায়ালা আগুন থেকে ইব্রাহীমকে বাঁচিয়ে নিলেন।" সুতরাং এ কথাই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)ও বলেছেন ঃ

آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے

—"আগুন আমার গোলাম (দাস), বরং উহা আমার গোলামদের (অর্থাৎ শিষ্যদের)-ও গোলাম।" সুতরাং আহমদীরা বহুবার এই আগুনকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত হতে দেখেছে।

হুজুর বলেন, কুরআন করীম আরও বলে যে, (নবীদের বিরুদ্ধবাদী) ঐ সকল ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে নেয় এবং ধর্মীয় দলিল-প্রমাণের ক্ষেত্রে নিজেদের বিফলতা ও ব্যর্থতাকে তারা রাজনৈতিক রূপদান করে সরকারের উপর চেপে বসে এবং প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় হয়। সুতরাং সূরা আল-শুয়ারা-এর ৫৩ থেকে ৫৭ নং আয়াতগুলিতে (মুসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় ধর্মীয় যুক্তিতে ফেরাউনের ব্যর্থতার পর রাজনৈতিক উপায়ে ক্ষমতার প্রভাব খাটানোর) বিষয়টিরই উল্লেখ রয়েছে। হুজুর (আইঃ) উক্ত আয়াতগুলির তরজমা এবং তফসীর বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিও এ মর্মে এলহাম নাজেল হয়েছিল যে, "মুসার উপর যেরূপ জামানা এসেছিল সেরূপ জামানা আমার উপরও আসবে।" (তাযকেরা পৃঃ ৪৩৬)

সুতরাং হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন যে, "ঐরূপ সময় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর আসে নাই এবং আজ (অর্থাৎ মুসলেহ মওউদের যুগ) পর্যন্তও এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই। অতএব এই ঘটনা ভবিষ্যতকালে কোন সময় সংঘটিত হবে।" (তফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)

হুজুর বলেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর সময় যখন তৎকালীন সরকার ও ফেরাউন (যুক্তি-তর্কে) হেরে গেলো এবং হযরত মুসা (আঃ) দলিল-প্রমাণের দ্বারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিলেন, তখন ফেরাউন বললোঃ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ—("আমাকে ছেড়ে দাও যেন আমি মুসাকে হত্যা করতে পারি।") একই এবারত (বাক্য) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিও এলহাম করা হয়েছে। (তাযকেরা, পৃঃ ৪৪৬)

হুজুর বলেন, এলহাম (বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী) যার উপরে পূর্ণ হয়, তার জন্য মুলহামের সমমর্যাদা-সম্পন্ন হওয়া জরুরী নয়। এলহাম তো কোন গোলামের মাধ্যমেও পূর্ণ হয়ে থাকে। সেই আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, উক্ত কথাটি আমি অর্থাৎ 'খলিফাতুল মসীহ রাবে' ব্যতীত অন্য কোন যুগ-খলিফার সম্পর্কে মানুষে বলে নাই যে, একে পাকড়াও কর এবং হত্যা কর এবং কতলের মোকদ্দমায় তাকে জড়িত কর, (যেমন কিনা হযরত মুসা (আঃ)-এর উপরে কতলের অভিযোগ দেয়া হয়েছিল)। সুতরাং এই ছিল (পাকিস্তান) সরকারের প্রোগ্রাম। এরপর ফেরাউন (আলোচ্য আয়াতগুলিতে বর্ণিত) যে দুটি যুক্তির অবতারণা করেছিল তা ছিলঃ —إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ অর্থাৎ "সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলবে।" এবং يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ অর্থাৎ "সে যখন তবলীগ করবে তখন ফসাদ হবে।"

উক্ত দুইটি যুক্তিই আজ পাকিস্তান সরকার অন্যদেরকে জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত ভাবে দূতাবাসগুলিতে পাঠিয়েছে এবং ইহা লিখিতরূপে আমাদের নিকটও পেঁছে গেছে।

অতএব, কুরআন করীম কি মহান ও আজিমুশশান কিতাব যে ইহা প্রত্যেক যুগের ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে।

হুজুর বলেন, এরপর কুরআন করীম বলে যে, উক্ত ব্যাপারটি যখন আরও বিস্তৃতি লাভ করে, তখন পেশাগত বিরুদ্ধাচরণকারীদের ক্রয় করা হয় এবং বিরুদ্ধাচরণের কাজের জন্য বেতন দেয়া হয়। আল্লাহ-তায়ালা বলেনঃ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ۝ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

এ ব্যাপারটিও বিস্ময়াতীত শানের সহিত বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়ে চলেছে। কেননা ইসলামের পূর্ববর্তী ও প্রাথমিক কালে তো এরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই, পেশাগত ভাবে কোন বিরুদ্ধাচরণ ছিল না। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সময় থেকে হাজার হাজার এরূপ আলেমের উদ্ভব হয়েছে

যারা 'তাকযীব'—'সত্যের প্রত্যাখ্যান ও বিরুদ্ধাচরণের' পারিশ্রমিক খাচ্ছে, এবং আজ যদি এ সকল লোক আহমদীয়াতের সমর্থন করতে আরম্ভ করে অথবা গালি দেয়াই বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদের 'ইনকাম' বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং কোন কোন আলেম যখন আহমদীয়াতের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা উহার সত্যতা স্বীকার করে নেয় তখন তারা আবার বলে যে, 'আমরা যদি আহমদীয়াত গ্রহণ করি তাহলে আমাদের রিজিকের কি দশা ঘটবে? এবং উহার কি ব্যবস্থা হবে?'

অতএব, এরা চিন্তা করে না যে বিরুদ্ধাচরণের ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরা কিসে পরিণত হয়ে চলেছে এবং আমাদেরকে কিসে পরিণত করছে। আমরা তো হলাম সেই জাতি, যারা কখনও নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। কোন একজন কবি বলেছেন: ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

অর্থাৎ—আমাদের রূপরেখা তো ভূ-পৃষ্ঠে অঙ্কিত রয়েছে।" কিন্তু আমরা (আহমদীরা) হলাম ঐ সকল লোক যাদের রূপরেখা পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠা সমূহে অঙ্কিত আছে। অতএব কুরআনের রেখা সমূহকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে কে?

কিন্তু কুসআন শরীফ তাদের যে চিত্র তৈরী করছে; তাথেকে তো জানা যায় যে এ সকল 'আইম্মাতুল-কুফর' (কুফরী ফতোয়া দানের হোতা ও নেতারা) নিজেদের আর বদলাবে না, কাজেই তাদের তকদীরও বদলাবে না। পক্ষান্তরে, যারা প্রকৃত বিষয় ও অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের সম্বন্ধে আপনারা কখনও অমঙ্গল কামনা করবেন না এবং তাদেরকে নিজেদের দোওয়াতে কখনও ভুলবেন না। যদিও দৃশ্যতঃ চতুর্দিক অন্ধকার, আর অন্ধকারই পরিদৃষ্ট হচ্ছে কিন্তু খোদাতায়ালা তো নূর ও আলোর খোদা, এবং তিনি অন্ধকাররাশি থেকেই নূরের ফুয়ারাও উৎসারিত করে দেন। অতএব সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে ফতোয়া দিবে না। কেননা এরূপ লোক আবার এদের মধ্য থেকেই উদ্ভাবিত হয় যারা নিজেদের জালিম পিতৃপুরুষদের কর্মকলাপের প্রতি অভিসম্পাতকারী হয়ে থাকে। তারা অন্ধকাররাশী থেকে বের হয়ে নূরের দিকে চলে আসে এবং তাদের পিতৃপুরুষরা যাদের প্রতি অভিশাপ দিতে দিতে ক্লান্ত হতো না তাদের প্রতি তারা রহমত প্রেরণে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয় না এবং ক্রন্দনরত হয়ে দিনেও রহমত কামনা করতে থাকে এবং রাত্রিতেও রহমত কালনা করে থাকে, এবং তাদের পিতৃপুরুষ যারা সেই পবিত্রাত্মাদেরকে অভিসম্পাত করতো, সেই পিতৃপুরুষদের উপর তারা নিজ মুখে অভিসম্পাত করে।

এটাই হলো জাতিবর্গের তকদীর (ভাগ্যলিপি), যা কিনা চিরকাল থেকে জারী আছে এবং চিরকাল জারী থাকবে। খোদা করুন এবং আমাদের দোওয়া এই যে, ঐ সকল লোক যারা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে লা'নতের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয় তারা অতি স্বল্প সংখ্যক হোক। আল্লাহতায়ালার হেদায়েতের জ্যোতি শীঘ্র প্রস্ফুটিত ও উদভাসিত হোক এবং শীঘ্র সে দিন উদিত হোক, যে দিনটি হবে আপনাদের আনন্দের দিন, সুসংবাদ সমূহের দিন, ঐশী সাহায্য, সাফল্য ও বিজয়ের দিন এবং তসবিহ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা) ও হাম্‌দ (তাঁর প্রশংসা) করার দিন। সে দিনটি নিজেদের স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের দিন হবে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যিক্‌র ও তাঁদের মহিমা ও মাহত্ম্য প্রকাশের দিন হবে।

(সাপ্তাহিক 'আল-নস্‌র' ৫ই জুলাই' '৮৫)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

১। "মসীলে ঈসা" সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ঃ

(ক) আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনের সুরা নূরের সপ্তম রুকুতে মুসলিম উম্মত হতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন :—

"ওয়াদাল্লাহুল লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলু সালেহাতে লা-ইয়াসতাখালেফন্নাহুম ফিল আরদে কামাসতাখলাফাল লাযীনা মিন কাবলিহিম।" (আয়াত ৫৬)

অর্থঃ—"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাহাদের সংগে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা বানাইবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে খলিফা বানাইয়াছেন।"

উপরোক্ত আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মুসায়ী উম্মতের সংগে সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য আরবী 'কামা' (অনুরূপ বা সাদৃশ্য) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সংগে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য 'কামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (সুরা মুজাম্মিল, আয়াত ১৬)। তৌরাতেও মূসা-সদৃশ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (ডিউটারোনমি, ১৮ : ১৫—২০)। এই উপমা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের ইংগিত দেওয়া হয়েছে—বস্তুতপক্ষে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শুধু হযরত মুসা (আঃ) হতেই শ্রেষ্ঠতর নহেন, তিনি সর্বকালের নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। উপরোক্ত সুরা নূরে খেলাফতের রূপরেখা সম্বন্ধে যে সাদৃশ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে সাধারণভাবে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যস্থিত সাদৃশ্য এবং তাঁদের অনুসারীগণের সাদৃশ্য ছাড়াও বিশেষভাবে বর্তমান যুগের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইংগিৎ রয়েছে। ইহুদীদের চরম অধঃপতনের যুগে হযরত ঈসা (আঃ) মুসায়ী শরীয়তের শেষ খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর আগমনের পর চতুর্দশ শতাব্দীতে। এই ঘটনাবলীর সংগে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রেখে মুহাম্মদী শরীয়তে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে এমন একজন খলিফা আসা আবশ্যক, যিনি আত্মিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও আদর্শে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ হবেন। 'হযরত ঈসা-সদৃশ' এরূপ খলিফাকেই হাদীসে 'প্রতিশ্রুত ঈসা' (মসীহ মাওউদ) এবং 'ইমাম মাহদী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(খ) উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সমর্থনে নীচে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

ইবনে মাজার হাদীসে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে 'খলিফাতুল্লাহিল মাহদী' (আল্লাহর খলিফা মাহদী) বলা হয়েছে : "ফা এযা রায়াইতুমুহু ফাবাই-উহু ওয়া লাও হাবওয়ান আলাছ ছালজে ফা-ইন্নাহু খলিফাতুল্লাহিল মাহদীউ"। (অর্থ :—"ইমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া

মাত্রই তাঁর হাতে বয়েত (দীক্ষা গ্রহণ) করিও— এমন কি যদি বরফের উপর হামগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহদী)।

অন্য একটি হাদীসে আখেরী যুগে মসীহ (আঃ)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে : "কায়ফা তাহ্‌লেকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালিহা ওয়াল মসীহু কি আখেরিহা।" (অর্থঃ— "আমার উম্মত কেমন করে ধ্বংস হবে যার প্রথমদিকে আমি রয়েছি এবং শেষ দিকে মসীহ রয়েছেন ?"—মেশকাত ও জামেউস সগীর)।

তিরমিযি শরীফের একটি হাদীসে মুহাম্মদী উম্মতের অবস্থার সংগে বনী ইস্রায়েলী অবস্থার সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে : "লাইয়াতিআন্না আলা উম্মতি কামা আতা আলা বনী ইস্রাঈল" (অর্থ :—"আমার উম্মত বনী ইস্রাঈল জাতির অনুরূপ হবে")।

অন্য একটি হাদীসে মুসলিম ইতিহাসের একটি রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বলেছেন :

"তাকুন ফিকুমুন নবুওয়াতু মা-শায়াল্লাহু তা'লা, আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফায়ুল্লাহু তালা সুম্মা তাকুনু ফিকুমুল খেলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে ফাতাকুনু মা-শায়াল্লহুতালা আন তাকুনা; সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতা'লা' সুম্মা তাকুনু ফিকুম মুলকান আয-যান ফাতাকুনু ফিকুম মাশায়াল্লাহুতা'লা আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফায়ুহাল্লাহুতা'লা সুম্মা তাকুনু মুলকান জাবারিয়ান ফাতাকুনু ফিকুমা মাশায়াল্লাহুতায়ালা আনতাকুমা সুম্মা ইয়ারফায়াল্লাহুতায়ালা সুম্মা তাকুনু ফিকুমুল খিলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে ; সুম্মা সাকাতা " (মেশকাত-বাবুল এনযার ওয়াত তাহযীর পৃ—৪৬৫)

অর্থ :—"আল্লাহতায়ালা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে এই নবুয়ত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুয়তের তরিকায় খেলাফত হইবে। যতদিন আল্লাহতা'লা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পরে জুলুমের পথে রাজতন্ত্র কায়েম হইবে এবং যতদিন আল্লাহতায়ালা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে। তাহার পর জোরপূর্বক শাসন (তথা সাম্রাজ্যবাদ) কায়েম হইবে এবং আল্লাহতালা যতদিন চাহেন উহা ততদিন থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তারপর পুনরায় নবুয়তের তরীকায় খেলাফত কায়েম হইবে। অতঃপর তিনি (সাঃ) চুপ রহিলেন।"

উপরোক্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হয়ে বর্তমান যুগে এসে "খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত" পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতে রাশেদা (৬৩২-৬৬১ খৃঃ), অতঃপর রাজতন্ত্রমূলক উমাইয়া শাসন-ব্যবস্থা (৬৬১—৭৫০ খৃঃ), তারপর আব্বাসীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ) এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (১২৮৮-১৯০৮ খৃঃ) দ্বারা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত ভাবে উক্ত হাদিসের শেষাংশে বর্ণিত "খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত" সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এই

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ওসমানীয় সাম্রাজ্যবাদের শেষদিকে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়াই যুক্তিসংগত।

২। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাবের প্রতিশ্রুতিঃ

মুসলিম উম্মতের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য, ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রচারের জন্য এবং পৃথিবী ব্যাপী সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে আখেরী যুগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রামাণ্য হাদীসের গ্রন্থাবলী হতে এই সকল প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্যাবলী রয়েছে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(ক) সহী বুখারী শরীফের হাদীসে প্রতিশ্রুতি রয়েছেঃ "কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ইবনু মার-ইয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম।" অর্থঃ—তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে 'ইবনে মরিয়ম' আবির্ভূত হবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের ইমাম হবেন")।

(খ) অনুরূপভাবে সহী মুসলিম শরীফে প্রতিশ্রুতি রয়েছেঃ "কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ঈসাবনু মার-ইয়ামা ফিকুম ফা-আম্মাকুম মিনকুম।" (অর্থঃ—"তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন! ফলতঃ তিনি তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের নেতৃত্ব দান করবেন")।

(গ) সহী ইবনে মাজা শরীফে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মাহদী ও ঈসা ইবনে মরীয়ম একই ব্যক্তি হবেন ("লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসাবানু মারাইয়ামা")।

সুতরাং এই ধরণের বর্ননা হতে প্রমাণিত হয় যে হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার করলে এই সকল হাদীসকেই (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা বলে অভিহিত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হবেঃ (ক) আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্বে বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) কি সশরীরে এই পৃথিবীতে পুণরায় আবির্ভূত হবেন, অথবা (খ) সেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ কোন মহাপুরুষ (অর্থাৎ 'মসীলে ঈসা' হিসেবে) মুসলিম উম্মত হতেই আবির্ভূত হবেন? পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং সশরীরে এই পৃথিবীতে এসে তাঁর পক্ষে ইসলামের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব পালন করার প্রশ্নই উঠেনা। এমতাবাস্থায় 'মসীলে ঈসা' হিসাবে মুসলিম উম্মত হতেই তাঁর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হওয়টাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত ভাষার এরূপ সাদৃশ্য ও প্রতীকপূর্ণ প্রয়োগ এবং সেগুলির ব্যাখ্যা ও তাবির করার রীতি রয়েছে। স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তটি নীচে উল্লেখ করা হলো।

ইহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (মালাখী ৪ঃ৫ এবং রাজাবলি ২ঃ১১ পদ) ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, এলিয়া নবী (অর্থাৎ হযরত ইলিয়াস আঃ) আকাশে জীবিত রয়েছেন এবং ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে প্রথমতঃ তিনিই আকাশ হতে অবতরণ করবেন। ইহুদীদের এই দাবীর উত্তরে সমাগত নবী হযরত ঈসা (আঃ) বলেন যে, উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে (মথি ১১ঃ১৪ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে (১) হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর মসীল (অনুরূপ বা সদৃশ) হিসেবে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে, (২) আকাশ হতে কোন ব্যক্তির সশরীরে অবতরণ করার ধারণা পূর্বেও ছিল এবং সেই ধারণা একজন 'সদৃশ' নবীর আগমনের দ্বারা রূপকভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং (৩)

অদ্যাবধি যে সকল ইহুদী এই ধারণা অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে তাদের আশা কোন দিনই পূর্ণ হবেনা।

তেমনিভাবে বর্তমান কালে যারা ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে "বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশ হতে (প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আকাশে অবস্থান করার পর) বর্তমানের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মুসলিম জাতিসহ বিশ্বকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন"—এই আশায় দিন কাটাচ্ছে তারাও অতীতের ন্যায় ভুল করছেন এবং তাদের সেই আশা কোনদিনই বাস্তবে পূর্ণ হবে না। কারণ কোন মানুষের পক্ষে এই দীর্ঘসময় ধরে আকাশে বসবাস করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনের দ্বারা পূর্ণ হওয়াই অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও ইয়াহিয়া (আঃ)-এর ঘটনা দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। এই বিষয়টির মধ্যে যে তত্ত্ব ও তথ্যগত সূক্ষ্মতা রয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্য বাহ্যিক জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াও আল্লাহর কাছে দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা উচিত।

(ঘ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে। নিম্নোক্ত বরাতগুলির আলোকে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পবিত্র কুরআনের ত্রিশটি আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন। এই সকল আয়াতের বরাত নিম্নে দেওয়া হলো ('বিসমিল্লাহ' বিশিষ্ট আয়াতকে ১নং আয়াত ধরে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে) ঃ—

সূরার নাম	আয়াত	সূরার নাম	আয়াত	সূরার নাম	আয়াত
(১) আলে ইমরান—	১৪৫	(১১) নেছা—	১৫৮-১৫৯	(২১) আলে ইমরান —	৫৬
(২) মায়েদা—	৭৬	(১২) বনী ইস্রাঈল—	৯৪	(২২) আহযাব—	৪১
(৩) আম্বিয়া—	৯	(১৩) রহমান—	২৭-২৮	(২৩) মায়েদা—	১১৮
(৪) মরিয়ম—	৩২	(১৪) বাকারাহ—	২৫৬	(২৪) নেছা—	১৬০
(৫) নহল—	২১	(১৫) ইয়াসীন—	৬৯	(২৫) রূম—	৪১
(৬) বাকারাহ—	১৪২	(১৬) ফজর—	২৮-৩১	(২৬) মুমিনুন—	৫১
(৭) আম্বিয়া—	৩৫	(১৭) নেছা—	৭৯	(২৭) ফাতির—	৪৪
(৮) মুমিনুন—	১৬	(১৮) তা-হা—	৫৬	(২৮) ফুরকান—	২১
(৯) মুরসালাত—	২৬-২৭	(১৯) ফুরকান—	৮	(২৯) নহল—	৭১
(১০) আরাফ—	২৬	(২০) মায়েদা—	১৮	(৩০) দুখান—	৫৭

ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে হাদীসের প্রমাণ ঃ—

১) "রা-আইতু ঈসা ওয়া মূসা ওয়া ইবরাহীমা ফা-আম্মা ঈসা ফা-আহ-মারু জাদ্‌দুন আরিজুস সাদরে।" (বুখারী খন্ড—২) অর্থঃ—আমি (কাশফে) ঈসা মূসা, ও ইবরহীম (আঃ)-কে দেখেছি। ঈসার রং লাল এবং তাঁর কেশ কুকড়ানো এবং বক্ষ প্রশস্ত।

(২) "লাও কানা মুসা ওয়া ঈসা হাইয়াইনেলামা ওয়াসিয়া হুমা ইল্লাত তিবায়ী ?"

অর্থ ঃ—"যদি মুসা ও ঈসা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমার অনুসরণ ব্যতিরেকে তাঁহাদের কোন গতি ছিল না।" (ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃঃ-২৪৬)।

এই দু'টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ন্যায় হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন।

(৩) "আম্মা বা'দু মান কানা মিনকুম ইয়াবুহু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামা ফা-ইন্না মুদাম্মাদান কাদ্‌মাতা ওয়ামান কানামিনকুম ইয়াবুদুল্লাহা ফা-ইন্নাল্লাহা হাইনউ লা-ইযামুতু কালাল্লা'হুতা'লা ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন কাদখালাত মিন কাবলিহির রুসুল।"

অর্থ : "(হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন : অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইবাদত করিত তাহারা জানিয়া রাখো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওয়াফত হইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত তাহারা জানিয়া রাখো যে, আল্লাহ জীবিত এবং তাঁহার মৃত্যু নাই। (অতঃপর তিনি বলিলেন যে, আল্লারতায়ালা বলিয়াছেন : মুহাম্মদ একজন রসুল ব্যতিত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার পূর্ববর্তী সকল রসুলই মরিয়া গিয়াছেন।" (বোখারী-কিতাবুল মগায়ী)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে সংঘটিত অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পূর্ববর্তী সকল রসুলই ইন্তেকাল করেছেন। পূর্ববর্তী রসুলদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত এবং তাঁর ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমের কথা কোন সাহাবী লথাপন করেন নাই। ফলতঃ এই ঘটনার দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) সহ পূর্ববর্তী সকল নবীর ওফাত প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহাবীগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বুজুর্গানে-দ্বীনের অভিমত অনুযায়ী ওফাতে ঈসা (আঃ) ঃ

(১) হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (২) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন : "ওলাকাদ কবেযা ফিল-লাইলাতিল্লাতি উরিজা ফিহা বিরূহে ঈসা ইবনে মার-ইয়ামা লাইলাতা সাবয়িনা ওইশরীনা মিন রামযানা।" "তিনি (হযরত আলী রাঃ) সেই রাত্রে ইন্তেকাল করিয়াছেন যে রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আত্মা উত্থিত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন—ঐ রাত্রিটি ছিল ২৭শে রমযান।" (তাবাকাতে ইবনে সাদঃ খণ্ড-৩) (৩) ইমাম মালেক (রহঃ) বিশ্বাস করতেন যে হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। (মজমাউল বেহার, খণ্ড-১ পৃঃ-২৮৬)। (৪) মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর আল্লামা শেলতুত অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেছেন ('আল-ফতোয়া' মুজাল্লাতুল আজহার, ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ইং) (৫) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নানুতুবী বলছেন যে, সকল নবীই মৃত্যু বরণ করেছেন (লতায়েফে কাসেমীয়া, পৃঃ-২২)। (৬) মৌলানা আকরাম খাঁ সুরা আল-ইমরানের তফসিরে ৩৯ নং টীকায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। এতদ্ব্যতিত অনেক বুজুর্গান এবং তফসিরকারক হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাতের কথা স্বীকার করেছেন।

ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঃ

(১) "ডেডসীক্রোল" নামে পরিচিত কতগুলি আদি খৃষ্টান সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়েছে কামরান উপত্যকা হতে। এই সকল লেখা হতে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর পার্বত্য কবরের গুহায় তিন দিন অবস্থানের পর সুস্থ হয়ে অন্যত্র হিজরত করতে চলে যান।

['The Riddle of the Scrolls' by H. E. Del Medico পুস্তক দ্রষ্টব্য]

(২) ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' পুস্তকের 'জেসাস ক্রাইষ্ট' শীর্ষক বর্ণনার সংগে যীশুর যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের তিনটি তৈলচিত্র দেখানো হয়েছে। এই ছবিগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশুখৃষ্ট পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

(৩) ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ এবং বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী যীশুখৃষ্টের কবর হতে নির্গমন, গ্যালিলী নামক স্থানে শিষ্যদের সংগে সাক্ষাৎকার এবং জৈতুন পাহাড় অতিক্রম করে অন্যত্র হিজরতের ঘটনা, আফগানিস্তান ও কাশ্মীর অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য ইস্রায়েলী গোত্রের নিকট ধর্ম-প্রচার, কাশ্মীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং সেখানে তাঁর সমাধিস্থ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে "মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ" "ওফাতে ঈসা (আঃ)" Where did Jesus Die, Tomb of Jesus, Truth About Crucifixion, Did Jesus Redeem mankind, Deliverance of Jesus from the Cross, Death of Jesus and the Renaissance of Islam প্রভৃতি পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য (পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম প্রচারকেন্দ্র হতে পুস্তকগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা আঃ ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি সশরীরে পৃথিবীতে আগমন করবেন না। এমতাবস্থায় সহী হাদিসে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ তাঁর আবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার দ্বারা 'মসীলে ঈসা' বা 'ঈসা সদৃশ' মহাপুরুষের আবির্ভা'ঈসা-বকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইলিয়াস আঃ-এর মসিলরূপে হযরত ইয়াহিয়া আঃ-এর আগমনের ঘটনাও এভাবে পর্ণ হয়েছে। সুতরাং যারা আকাশ হতে হযরত ঈসা আঃ-এর সশরীরে আগমনের প্রতিক্ষায় আজও বসে আছেন তাঁদের সেই আশা শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেলেও বাস্তবায়িত হবে না। অন্যদিকে সহী হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীকেও মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ 'মসীলে ঈসা' হিসেবে মুসলিত উম্মত হতে আগমনকারী মহাপুরুষের মাধ্যমেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পর্ণ হওয়াই যুক্তিসংগত এবং বাস্তবায়িত।

(ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মৌদুদীর আয়নায় ওফাতে ঈসা ও নজুলে মসীহ

জামাতে ইসলামীর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা" লিখেছে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মৌদুদী তার বিখ্যাত তফসীর তাফহীমুল কোরআনে সূরা আহ্‌জাবের ৪০নং আয়াতের (খাতামাননবীইন বিষয়ক) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একুশটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন...... এ হাদিসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত ঈসা (আ:)-ই আল্লাহর হুকুমে পুণরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন......তিনি তখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন অথবা কোথাও জীবিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছেন এ বিষয়ে বিতর্ক তুলে কোন ফল পাওয়া যেতে পারে না। তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেও থাকেন তাহলে আল্লাহতায়ালা তাঁকে পুনরায় জীবিত করে নিয়ে আসতে সম্পূর্ণ সক্ষম (২৩শে নভেম্বর ১৯৮৪)। এখানে মওদুদী সাহেব বলেছেন, ঈসা (আ:) এর মৃত্যু হয়ে থাকলেও আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জীবিত করে নিয়ে আসতে সক্ষম। অথচ এই মৌদুদী সাহেবই তার তাফহীমুল কোরআনে অন্যত্র লিখেছেন, 'মরিয়া যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া মানুষ এই দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবে এই কথা তাহাদেরকে কে বলিয়াছে? (১৪শ খণ্ড ১৫১ পৃ:। আরও শুনুন, "অথচ তাহাদেরকে এই কথা কেহই বলে নাই যে এই দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন ভাবে কখনো কখনো মুর্দাকে জিন্দা করা হইবে। বরং তাহাদেরকে শুধু এতটুকু বলা হইয়াছে যে কেয়ামতের পর আল্লাহতায়ালা একই সময় সমস্ত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন (১৭৪ পৃ:)। এক জায়গায় বলেছেন, মৃতকে আল্লাহতায়ালা জীবিত করে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। আবার অন্যত্র বলছেন, মৃত কখনো জীবিত হয়না, কেয়ামতের সময়ই কেবল মুর্দা জিন্দা হবে। এই মৌদুদী সাহেব তাঁর এই তফসীরেই বলেছিলেন, 'হযরত ঈসা মসীহ (আ:) তাঁহার জীবনের শেষ আড়াই তিন বৎসরের মধ্যে......জীবদ্দশায়ই লিখিয়া ও সুসংবদ্ধ করিয়া গিয়া ছিলেন (২য় খণ্ড ৭ পৃ:)। এতে দেখা যায় ঈসা (আ:)-এর মৃত্যুর কথা মৌদুদী সাহেব পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। ঈসা (আ:)-এর জীবনের "শেষ আড়াই তিন বৎসর" অর্থই তো তিনি এই আড়াই তিন বৎসর পর মৃত্যু বরণ করেছেন। আরো শুনুন, উক্ত তাফসীতে তিনি লিখছেন, 'হযরত ঈসা (আ:)-এর সশরীরে উত্থান লাভের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি হইতে দূরে থাকিতে হইবে এবং তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাও পরিষ্কার করিয়া বলা যাইবেনা (২৩৮ পৃ:)। কি চমৎকার! ঈসার জীবিত থাকা বা মৃত্যু বরণ করার ব্যাপারে হঁা-না কিছুই বলা যাবেনা তবে কি বলতে হবে? মৌদুদী সাহেবের এ হেন বহুরূপী কথা-বার্তায় তেলেসমাতী লক্ষ্য করে তার এক কালের সহকর্মী মৌলানা আমিন আহসান ইসলাহী বলেছিলেন, মৌদুদীর কোন্ বক্তব্যের মেয়াদ কতদিন তা ঔষধের পেকেটে ঔষধের মেয়াদের ন্যায় লাল কালিতে লিখে দিন (আলমিম্বর, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৪)। এককালের জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'জাহানে নও' লিখেছিল,

"হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পাঁচশ' বৎসর পর সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ায় এইরূপ একটি জাহেলী যুগের সূচনা হয়।" তারপর লিখেছিল, "হযরত মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)ও যদি আমাদের নবী করীমের (সাঃ) পরে আগমন করতেন তাহলে তারাও এ শরীয়তের আনুগত্য স্বীকার করতেন (ইসলামী আন্দোলন সংখ্যা—১৩৬৯, ২৫ ও ৩৩ পৃঃ)।" এথেকেও বুঝা যায় যে জামাতপন্থীরা মৌহুদী সাহেবের অস্পষ্ট এবং পরস্পপর বিরোধী বক্তব্যের ফলে আহমদীদের বিরুদ্ধে ভিন্ন কথা বললেও কখনো কখনো স্পষ্টভাবে ঈসার মৃত্যু স্বীকার করেছে এবং ঐ ঈসা যে আর কখনো এই পার্থিব জগতে ফিরে আসবেন না তাও বর্ণনা করেছে। আহমদীরা শেষ যুগে সেই দুই হাজার বৎসর আগের ঈসা নবীর আগমনে বিশ্বাসী নয়। তারা বলে আখেরী জামানায় যে মসীহ নবীউল্লাহ্‌র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী আছে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ারই এক ব্যক্তি। ঐ প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ঈসা মসীহের গুণে গুণান্বিত হয়ে এই উম্মতে আবির্ভূত হবেন। মৌহুদী সাহেব লিখেছেন, "ইহুদীরা একজন মসীহের আগমণের অপেক্ষায় ছিল,......কিন্তু তাহাদের এই আশা ভরসার বিপরীত হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) যখন খোদার তরফ হইতে মসীহ হইয়া আসিলেন .... তখন ইয়াহুদীরা তাঁহাকে মসীহ রূপে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টিত হইল" (তফহীমুল কুরআন ১২শ খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)। অনুরূপ আমরাও বলি, মুসলমানরা একজন মসীহের আগমন অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ও আশা-ভরসার বিপরীত হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ যখন খোদার তরফ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আবির্ভূত হলেন তখন মুসলমানরা তাঁকে মসীহরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং তাঁকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টিত হল।

আল্লার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার এটা কোন নূতন বিষয় নয়। পবিত্র কুরআন বলে, 'যে সব লোক বাজে ও মিথ্যা কথার দ্বারা অন্যদেরকে আল্লার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আল্লার প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের জন্য রয়েছে অপদস্তকর শাস্তি' (সূরা লুকমান, ৭ আয়াত।)।

মৌহুদী সাহেব লিখেছেন, "সব যুগে এইরূই হইয়া আসিয়াছে। যখন কোন নবী-পয়গাম্বর দুনিয়ার মানুষকে সত্য পথ ও সঠিক আদর্শে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা চালইয়াছেন তখনি সমস্ত শয়তানী শক্তি তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে" (তাফহীম ৩/১৭১)। তিনি আরো বলেছেন, "তাহাদের সেই সব চাল-চাতুর্য ও কুটিল ষড়যন্ত্র এবং শোবাহ্‌-সন্দেহ ও প্রশ্নাবলী যাহার সাহায্যে তাহারা জনগণকে ইসলাম প্রচারক এবং তাহার দাওয়াত উভয়ের বিরুদ্ধে উস্কানি দিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিত" (ঐ)। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, "সহজ সরল পথ যাহা তাহাদের সামনে পেশ করা হইতেছে তাহা তাহারা পছন্দ করেনা। তাহারা চায় যে এই পথ তাহাদের ইচ্ছা বাসনা ও কামনা মোতাবেক এবং তাহাদের পূর্ণ হিংসা-বিদ্বেষ এবং তাহাদের কল্পনা, ধারণা ও ভাবনা অনুযায়ী বাঁকা হইয়া থাকে (ঐ ৬/১৮)।"

আহমদী জামাতের বিরুদ্ধেও এই একই মানসিকতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। হয়ত জামাত পন্থীরা বলবেন, কোথায় সেই সব অতীতের নবী-রছুল আর কোথায় আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা! এই দু'য়ের মধ্যে কি কোন তুলনা হতে পারে? জি, হ্যাঁ. আগের লোকেরাও তাই বলেছিল। মৌদুদী সাহেবের কথাতেই শুনুন, "কোথায় সেই পুরানা কালের বড় বড় নবী পয়গাম্বর, যাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত, আর কোথায় এই ব্যক্তি। ইহাদের মাঝে কোন তুলনাই হইতে পরে না" (ঐ ৭/১৭০)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আখেরী জামানায় আগমনকারী মসীহ নাজিল হবেন বলে হাদিছে বর্ণিত হয়েছে. অতএব এর দ্বারা সেই দুই হাজার বৎসর পূর্বের ঈসা নবীর পুনরাগমণই স্বীকৃত হচ্ছে। এর উত্তরে মৌদুদী সাহেবের নিম্নে বর্ণিত বক্তব্যগুলিই যথেষ্ট মনে করি. তিনি লিখেছেন, "কুরআনে নাজিল শব্দ সৃষ্টি করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে" (তাফহীমুল কুরআন, ১৬/১৬১, ১৬২)। তিনি আরো বলেছেন. "দুনিয়ায় যে রছুলই এসেছেন তিনি সহসা আকাশ থেকে নেমে আসেন নি, মানব সমাজ থেকেই তাঁর উদ্ভব হয়েছে" (ঐ ১৪/১১৫)। মৌদুদী সাহেবের মতে আকাশ অর্থ প্রবহমান বা শূন্য ও শূন্যলোকের মত জিনিষ (ঐ ৮/১৫৪)। আখেরী জামানায় যে মসীহর আবির্ভাব হবে তিনি হবেন ঈসাতুল্য এক ব্যক্তি। বাইবেলে বর্ণিত যোহনের আগমনে যেমন এলিয়ের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল তেমনি ঐ প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনে ঈসার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে। মৌদুদী সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন. ইয়াহিয়ার আগমনে এলিয়ের আসার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (ঐ ১৩/৯১, ৯২)। মৌদুদী সাহেব লিখেছেন, "মসীহ শব্দটি মূলতঃ খোদার তরফ থেকে 'নিয়োগকৃত' এর সমার্থক" (ঐ ১৭/১১৫)। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইয়াহিয়ার আগমনকে তৎকালীন ইহুদীরা যেমন এলিয়ের আগমনরূপে মেনে নেয়নি ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের মুসলমানরাও এই উম্মতে আবির্ভূত মসীহকে প্রতিশ্রুত ঈসা রূপে মানতে পারেনি। মৌদুদী সাহেব বলেছেন, "পতন যুগের মুসলমানরা ইহুদী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছে" (ঐ ৯/১২৭)। ইহুদী উলামারা ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে যেভাবে ফতোয়া দিয়েছে বর্তমান যুগের মোল্লা-মৌলবীরাও তদ্রূপ প্রতিশ্রুত মসীহর বিরুদ্ধে ফতোয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। কোরআনের মতে খোদাভীতি যার আছে সেই প্রকৃত আলেম। মৌদুদী সাহেব উলামার ব্যাখ্যায় লিখেছেন. "উলামা বলিতে কুরআন হাদিছ এবং ফেকাহ পড়া প্রচলিত উলামা..... বুঝায় নাই। .....উলামা হইবে তখন, যখন তাহাদের মধ্যে খোদার ভয় জাগবে" (ঐ ১২/২৭০)। যে সব আলেম নামধারী মানুষ হত্যা করে, কুরআন পোড়ায়, কলেমা মুছায়, মসজিদ ভাঙ্গে তাদের কি খোদাভীতি আছে? কেহ কেহ হয়ত বলবেন, আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তো নবী-রছুল হওয়ার দাবী করেছেন। এর উত্তরে জেনে রাখুন স্বয়ং মৌদুদী সাহেব ঈসার (আঃ) শিষ্যদেরকেও 'রছুল' বলেছেন (ঐ ২/৩৫)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "রছুল শব্দের অর্থ প্রেরিত ব্যক্তি। এই অর্থের দৃষ্টিতে আরবী ভাষায় দূত, বাণীবাহক.....নবী অর্থ সম্বন্ধে আভিধানিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।.....নাবা .....সংবাদ।" .....নবুওন অর্থাৎ উচ্চতা, উন্নতি।.....কোরআন মজিদে এই দুইটি শব্দ (নবী ও রছুল) প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে" (ঐ ৮/২৬)। ইমাম

মাহদীকে যে আল্লাতা'লা প্রেরণ করবেন সে ব্যপারে সবাই একমত। আল্লাহ্‌ যাকে প্রেরণ করেন আরবীতে তাকে কি বলে? সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীরা ইমাম মাহদীর জন্য আলায়হিচ্ছালাম ব্যবহার করে থাকেন। অতএব ইমাম মাহদী (আঃ) যে আলায়হিচ্ছালাম দরূদ প্রাপ্তদের একজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিশ্রুত মসীহর বিরুদ্ধাচরণ তাঁর সত্যতারই নিদর্শন। মৌদুদী সাহেব নিজেই বলেছেন, "আমার আশঙ্কা হয় তাঁর (ইমাম মাহদীর) বিরুদ্ধে মৌলবী ও সুফী সাহেবরাই সবার আগে চীৎকার শুরু করবেন" (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ২৫ পৃঃ) জানিনা মৌদুদী সাহেব এই কথা বলার সময় নিজেকে মৌলবী জ্ঞান করেছিলেন কি না! তবে তার শিষ্যেরা যে তাকে মৌলবী মৌলানার আসনে সমাসীন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৌদুদী সাহেব নিজেই উপদেশ দিয়ে গেছেন, "জনাব মৌলবী সাহেব আর জনাব পীর সাহেব কেবলা কি বলিতেছেন...এসব মাত্রই দেখিবে না এবং সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিবে না (মুসলমান কাহাকে বলে ২৭ পৃঃ)। আমরা ও সকল মৌদুদী পন্থীকে এই কথাই বলব যে, মৌলবী মৌদুদী সাহেবসহ অন্যান্য মৌলবীরা ও পীর সাহেব কেবলারা এবং সুফি সাহেবানরা প্রতিশ্রুত মসীহকে কি ফতোয়া দান করছেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লার তরফ থেকে প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে আর কাল বিলম্ব না করে মেনে নিন।

উল্লেখ্য যে ঈসার জীবিত থাকার বিশ্বাসটি খৃষ্টানদের প্রচারনার কালেই মুসলমান সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে। এবং এই বিশ্বাসকে আমাদের সহজ সরল তফসীরকারকেরা নিজেদের তফসীরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মৌদুদী সাহেব বলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের তফসীরকারকরাও কোরআনের এই আয়াতের তফসীরে বনী ইসরাইলের এই সব বর্ননা চক্ষু বন্ধ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (তাফহীমুল কোআন ৮/৯০)। তিনি এও বলেছেন, "এক শ্রেণীর লোক হাদিছ নামে বর্ণিত যে কোন কথাকে নির্বিচারে অবশ্যই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে" (ঐ ৮/১৬৮)। তাই আমরা মৌদুদীভক্ত পাঠকদেরকে বলব আপনারা উন্মুক্ত এবং অনাবিল মন নিয়ে কোরআনের আলোকে এই বিষয়টি বিচার করে দেখার চেষ্টা করুন। পূর্ব থেকে কোন ধারণা বা বিশ্বাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকলে সেই বদ্ধমূল বিশ্বাস আপনাদেরকে সত্য উদঘাটনে বাধার সৃষ্টি করবে। মৌদুদী সাহেব বলেছেন, "সর্বপ্রথম একেবারে উন্মুক্ত ও অনাবিল মন ও মস্তিষ্ক লইয়া বসিতে হইবে। পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা কল্পনা ও বিশ্বাস এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সকল লক্ষ্য হইতে মন ও মগজকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে।...... কারণ যাহারা পূর্ব হইতে বদ্ধমূল বিশেষ ধারণা ও মত মনে রাখিয়া কোরআন পড়িতে শুরু করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন না পড়িয়া উহার ছত্রে ছত্রে নিজেদেরই পূর্ব ধারণার পাঠ নূতন করিয়া গ্রহণ করে মাত্র" (ঐ কুরআন পরিচয় ২০ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "মাদ্রাসা খানকা ও টুলে বসিয়া উহার (কোরআন) অন্তর্নিহিত সমস্ত তত্ত্বকথা সঠিকরূপে জানিতে পারা সম্ভব নয়" (ঐ ২২ পৃঃ)। সত্যকে গ্রহণ করতে হলে সব রকমের অন্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত জরুরী। মৌদুদী সাহেব নিজেও বলেছেন, "ঈমান আনিয়া তোমরা যদি একমাত্র খোদায়ী আইনের অনুসারী হইয়া থাক......তবে তোমাদের সমাজের পন্ডিত, পুরোহিত, পোপ, পাদ্রী, পীর, মৌলবী, যোগী, ঋষি এবং তোমাদের বাপদাদারা জাহেলী যুগের যে সব অবাঞ্ছিত বিধি নিষেধের প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দাও" (ঐ, ১/১২৯)। আশা করি আমরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করবনা। তারা মসীহকে না মেনে যে মহা অন্যায় করে খোদার কোপগ্রস্ত হয়েছে বর্তমান উম্মত তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাগত সত্যকে গ্রহণ-বরণ করে নিবে। মৌদুদী সাহেব বলেছেন, "অতএব এই জাতির (বনী ইসরাইল) পর পরমুহূর্তে যে জাতি নেতৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা পূর্ববর্তী জাতির নিকট হইতে পরিণতি সম্পর্কে সর্বাধিক উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে" (ঐ, ১/১৫৯, ১৬০)।

— আহমদ তৌফিক চৌধুরী

ঈদুল আযহার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা সূরা হজ্জের ৩৩ হইতে ৩৬ নম্বর আয়াত তেলওয়াত করেনঃ—

ذلك - ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ٥ لكم فيها
منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ٥ ولكل امة جعلنا
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ط فالهكم اله
واحد فله اسلموا وبشر المخبتين ٥ الذين اذا ذكر الله وجلت
قلوبهم والصبرين على ما اصابهم والمقيمى الصلوة ومما رزقنهم
ينفقون ٥

(অর্থ ঃ "প্রকৃত সত্য এই যে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নির্দ্ধারিত নিদর্শনাবলীর সম্মান করিবে তাহার (এই কাজকে) হৃদয়ের তাকওয়া হিসাবে গণ্য করা হইবে। (স্মরণ রাখ যে) এই সকল কোরবানী হইতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েয। অতঃপর খোদার প্রাচীন গৃহ পর্যন্ত এইগুলিকে পৌঁছান জরুরী। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা কোরবানীর একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা এই চতুষ্পদ জন্তু, যাহা আল্লাহ তাহাদিগকে দান করিয়াছেন, ঐগুলির উপর তাহারা আল্লাহর নাম লয়। (অতএব স্মরণ রাখ যে) তোমাদের খোদা একমাত্র খোদা। অতএব তোমরা তাঁহার আনুগত্য কর এবং যাহারা (খোদার সম্মুখে) বিনয়াবনত হয় তাহাদিগকে সুসংবাদ দিয়া দাও। যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর নাম লওয়া হয় তখন এইরূপ লোকদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং এই সমস্ত লোকদিগকেও (সুসংবাদ দিয়া দাও) যাহারা নিজেদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি (আমাদের সন্তুষ্টির জন্য) উহা হইতে তাহারা খরচ করিতে থাকে"—অনুবাদক।)

অতঃপর বলেন ঃ—

আজ কোরবানীর ঈদ। এই ঈদের একটি পটভূমি বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কোরআন করীমে কোরবানীর যে পটভূমি বর্ণনা করা হইয়াছে, উক্ত বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে একটি খুব মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যদিও ইহুদী ও খৃষ্টানরা এই দিন (কোরবানীর দিন) পালন করেনা এবং এই দিন পালন করার ব্যাপারে তাহাদের ধর্মে কোন রেওয়ায়েতও দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি জবিহুল্লাহ (আল্লাহর নামে যে পুত্রকে জবেহ করা হয়) এবং এই মোকাম, যাহার সহিত এই কোরবানীর পুরাতন সম্পর্ক বিদ্যমান, এই দুইটি বিষয়ে তাহাদের রায় কোরআন করীমের রায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোরআন করীম বলে যে, এই কোরবানীর ঈদ যাহা তোমরা পালন করিতেছ ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে 'বাইতুল আতীকের' (প্রাচীনতম গৃহের) সহিত অর্থাৎ খোদার সবচাইতে প্রাচীন গৃহের সহিত, যাহা আল্লাহতায়ালা বান্দাদিগকে ইবাদতের জন্য দান করিয়াছেন। ইহা কবে নির্মিত হইয়া-

ছিল, সেই ইতিহাস আমাদের নিকট রক্ষিত নাই কিন্তু ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ইতিহাস হইতে আমারা জানিতে পারি যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে ইহা নূতনভাবে নির্মিত হইয়াছিল। তথাপি 'বাইতুল আতীক' শব্দটি বলিয়া দেয় যে, ইহা প্রচীনতম গৃহ। ইহার ইংরাজী অনুবাদ হইল Ancient (প্রাচীন)। ইহা জানা যায় যে, হযরত আদম (আঃ) প্রথম যেই গৃহটি খোদার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই গৃহ। ইহার সহিত কোরবানীর একটি ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে এবং এই ইতিহাস সুদীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইসলামের পূর্বেও আরববাসীরা এই 'বাইতুল আতীক'-কে কেন্দ্র করিয়া কোরবানী পেশ করিয়া থাকিত এবং হজ্জ পালন করিয়া থাকিত।

এই ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা এই যে, ঐ গৃহ যাহার সহিত কোরবানীর সম্পর্ক রহিয়াছে, উহা জেরুজালেমের একটি পবিত্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত, যেইখানে পুরোহিত 'হ্যায়কল' অবস্থান করিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসহাককে তথায় লইয়া গিয়া কোরবানী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুইটি বর্ননার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু বাইবেলের তুলনায় অধিক ন্যায় বিচারপ্রিয় ব্যাখ্যাকারীগণ এই কথা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বর্ননা করেন যে, বাইবেলের এই বর্ননা অনিবার্যরূপে ভ্রান্ত এবং ইহা পরবর্ত্তীকালের সংযোজন। পেট্‌স তাঁহার ব্যাখ্যায় লেখেন যে ঃ—

"এই কথা বলা যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসহাককে জেরুজালেম লইয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহাকে কোরবানী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে ও নিশ্চিতভাবে একেবারে ভুল। কেননা যে সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কোরবানীর সময় ছিল, অর্থাৎ যে সময়টিকে ইসহাক (আঃ)-এর কোরবানীর সময় বলিয়া অভিহিত করা হয়, ঐ সময় জেরুজালেম বিদেশীদের দখলে ছিল এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তথায় যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইতিহাস হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়না এবং বিবেকও ইহা স্বীকর করেনা যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসহাক (আঃ)-কে তথায় (জেরুজালেম) লইয়া গিয়াছিলেন।"

গৃহের (পূর্বোক্ত প্রাচীনতম গৃহের) ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, কোরআনের বর্ননা নিশ্চিত-রূপে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, ঐ গৃহ তথায় নাই, এই গৃহের সংগে কোন রেওয়ায়েতেরও সম্পর্ক নাই। অতএব কোরআন যেই গৃহের বর্ননা দেয় এবং যাহার সহিত প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত সম্পৃক্ত, ইহা ছাড়া অন্য কোন গৃহ হইতেই পারে না।

দ্বিতীয় মতবিরোধটি হইল পুত্র সম্বন্ধে। কোন্ পুত্রকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পেশ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে পেশ করিয়াছিলেন? এই দুইটি বিষয়েও বাইবেলের সহিত কোরআন করীমের মৌলিক মতবিরোধ রহিয়াছে। বাইবেল অনুযায়ী হযরত ইসহাক (আঃ)-কে কোরবানীর জন্য পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কোরআন করীম অনুযায়ী 'গোলামে হালিম'—অর্থাৎ কোমল-স্বাব বিশিষ্ট আল্লাহর দাস) কে অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কোরবানীর জন্য পেশ করা হইয়াছিল। কোরআন করীমে হযরত ইসহাক (আঃ)কে 'গোলামে আলীম' (অর্থাৎ জ্ঞানী গোলাম পুত্র) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে 'গোলামে হালিম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুইটি বৈশিষ্টের মধ্যে পার্থক্য করিয়া কোরআন করীম উভয় পুত্রের অবস্থানগত পার্থক্য নির্ণয় করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। পার্থক্যের ব্যাপারে বাইবেলের নিজ বর্ননার মধ্যে এইরূপ মৌলিক মতবিরোধ মওজুদ রহিয়াছে যে, ইহার বর্ণনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। বাইবেলের তিনটি উৎস রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এইগুলিকে জোড়াতালি দিয়া ও বিভিন্ন উৎসকে মিলাইয়া ঝুলাইয়া ঐ বাইবেল তৈয়ার করা হইয়াছে, যাহা আজকাল সাধারণভাবে বাইবেল নামে খ্যাত। কিন্তু ইহার মধ্যেও মত বিরোধ রহিয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ে অনুবাদ সংশোধনের নাম করিয়া ইহার মধ্যে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইতে থাকে।

একটি বাইবেল হইল উহা, যাহা খোদার নামে 'জেহুয়া' এর উল্লেখ করিয়াছে। ইহাকে 'জে' সংস্করণ বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'জে' হইতে 'জেহুয়া' হইয়াছে। যেহেতু

ইহার প্রথম শব্দ 'জে' অতএব ইহাকে 'জে' সংস্করণ বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বাইবেল হইল উহা, যাহাকে খোদার নামে 'জেহুয়ার' পরিবর্তে 'ইলুহীন' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহাকে 'ই' সংস্করণ বলা হয়। আর একটি সংস্করণ, যাহাকে 'কাহেনু' সংস্করণ বলা লইয়া থাকে, ইহা 'পি' সংস্করণ রূপে আখ্যায়িত।

কোন্ পুত্র ছিল? প্রথম পুত্র ছিল, না দ্বিতীয় পুত্র ছিল? ইসহাক নামের উল্লেখ আদৌও ছিল কি? এই সকল বিষয়ে তিনটি সংস্করণে মতবিরোধ রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে হয়, 'জে' সংস্করণে কোথাও হযরত ইসহাকের উল্লেখ করা হয় নাই এবং 'ইলুহীন' সংস্করণে অর্থাৎ 'ই' সংস্করণে হযরত ইসহাকের নাম ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অনেক খৃষ্টান লেখক ইহাকে 'পরবর্ত্তী সংযোজন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের মতানুযায়ী এই সংস্করণে হযরত ইসহাকের উল্লেখ ছিল না এবং অনুমান করিয়া বা আন্দাজ করিয়া ইহাতে ইসহাকের নাম ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও, যেখানে হযরত ইসহাক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সেখানেও অনুবাদে এত পার্থক্য রহিয়াছে যে, উহা দ্বারা উক্ত বর্ণনা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ মুল শব্দ যাহা 'ইবরানী' ভাষায় ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা 'উলাদুন' সম্পর্কিত হাদিস ছিল অর্থাৎ প্রথম এবং একমাত্র পুত্র সম্পর্কিত হাদিস ছিল। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীরা অথবা বাইবেলের অনুগামীরা যদি 'প্রথম ও একমাত্র পুত্র' এর কথা স্বীকার করিয়া লইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইত যে 'প্রথম পুত্র'তো হযরত ইসমাইল ছিলেন। এইজন্য তাহাদের পক্ষে ইহা মুসকিলের ব্যাপার হইত যে, তাহারা যেই কোরবানীকে ইসমাইলের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া ইসহাকের প্রতি আরোপ করিতে চায়, ঐ কোরবানী পুনরায় ইসমাইলের দিকে ফিরিয়া চলিয়া যায়। এইজন্য তাহারা 'ওলাদুন ইয়াহিদ' (একমাত্র পুত্র) এর পরিবর্তে 'ওলাদুন ইয়াবিদ' (প্রিয় পুত্র) অনুবাদ করিয়াছে। ইহার অর্থ খুবই স্নেহাস্পদ ও প্রিয় পুত্র। পক্ষান্তরে নিঃসন্দেহে ও অনির্বার্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলে ইবরানী ভাষায় যে মূল শব্দটি রহিয়াছে উহা হইল 'ওলাদুন ইয়াহিদ'। উহা 'ওলাদুন ইয়াবিদ' নয়। এই দুইটির মধ্যে বড় পার্থক্য রহিয়াছে। 'ইয়াহিদ' শব্দটি মূলতঃ আরবী ভাষার ওয়াহীদ শব্দের বিকৃতরূপ যাহা ওদ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ওদ্ বলা হয় স্নেহকে এবং 'ইয়াহিদ' উৎপন্ন হইয়াছে ওয়াহীদ বা আহাদ হইতে। ইহার অর্থ এই যে তাহার সহিত আর কেহ ছিল না।

যেহেতু শব্দ মিলিয়া যায় এবং নিয়ত ছিল বিকৃত, অতএব ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর ইচ্ছাকৃতভাবে অসাধুতার সহিত ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে। কেননা ঐ সময় যদি এই দাবী ইহুদীরা ও খৃষ্টানেরা মানিয়া লইত যে প্রকৃত কোরবানীওয়ালা পুত্র, যাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি ইসমাইল তাহাহইলে তাহারা ইসলামের পটভূমিকে খুবই উজ্জলরূপে দেখিতে পাইত এবং খৃষ্টানদের পক্ষে বা ইহুদীদের পক্ষে ইসলাম

গ্রহণ করা খুবই সহজ হইয়া যাইত। এই জন্য তাহারা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর জিদ করিয়া এই অসাধু কাজ করিয়াছে। তাহারা 'ইয়াহিদ' কে 'ইয়াবিদ' এ পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং আহাদ' কে 'মাহবুব' (প্রিয়) এ পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং এইভাবে জোর করিয়া কোরবানীকে এক পুত্র হইতে উঠাইয়া অন্য পুত্রের প্রতি আরোপ করার চেষ্টা করিয়াছে। মোট কথা কোন্ পুত্রের কোরবানীর কথা থিল—এই বিষয়েও খুব মতবিরোধ রহিয়াছে।

মত-বিরোধ কেবল পুত্রের ব্যাপারে নয়, বরং পুত্রের কোরবাণী কিভাবে দেওয়া হইয়াছিল—এই ব্যাপারেও মৌলিক মত-বিরোধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ যদি আপনারা বাইবেলের বর্ণনা পড়েন তাহা হইলে আপনারা হতবাক হইয়া যাইবেন। বাইবেল এই কোরবানীকে জবরদস্তিমূলক কোরবানী সাব্যস্ত করিয়াছে এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যে চিত্র অংকন করিয়াছে উহা নিত্যান্ত লোম-হর্ষক ও ভয়াবহ চিত্র। বাইবেলের কথাগুলি নিম্নরূপ। জেনেসিস (আদিপুস্তক) এর ২২ নম্বর অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে যেঃ—

"তুমি স্বীয় পুত্র ইসহাক, যে তোমার একমাত্র পুত্র এবং যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে সংগে লইয়া মোরিয়া অঞ্চলে যাও।"

এখন এইখানে "একমাত্র পুত্র" শব্দটিও নিশ্চিতরূপে একটি সংযোজন। কেননা হযরত ইসহাক তো একমাত্র পুত্র ছিলেন না। যখন ইহা সকলেই স্বীকার করে যে হযরত ইসমাইল প্রথম পুত্র ছিলেন তখন হযরত ইসহাকের "একমাত্র পুত্র" হওয়া সম্পূর্ণরূপে ভুল। "একমাত্র পুত্রের" সংগে "যাহাকে তুমি ভালবাস" যোগ করিয়া পূর্বোক্ত "ইয়াবিদ" শব্দের সংগে মিলাইয়া লইয়া তাহারা অনুবাদ করিয়াছে "সংগে লইয়া মোরিয়া অঞ্চলে যাও এবং সেখানে পর্বতমালার একটি পর্বত, যাহা আমি তোমাকে বলিয়া দিব, তাহাকে সোখ্‌তনী কোরবানীর (কোরবানীর পর লাশকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলাকে সোখ্‌তনী কোরবানী বলা হয়) জন্য উহার উপর চড়াও।" তখন সোখ্‌তনী কোরবানীর জন্য ইব্রাহীম (আঃ) অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সংগে চারিটি জামা এবং দুইজন যুবক এবং স্বীয় পুত্র ইসহাককে লইলেন এবং সোখ্‌তনী কোরবানীর জন্য কাঠ চিরিলেন। অতঃপর তিনি উঠিলেন ও খোদা যেই জায়গার কথা বলিয়াছিলেন তথায় রওনা হইলেন।

এই কাহিনী একটি কল্পিত কাহিনী, যেমন কিনা হিট্‌স এর ব্যাখ্যাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ইসহাককে লইয়া ইব্রাহীম (আঃ) যেই জায়গায় গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, ঐ জায়গাতো তাঁহার আয়ত্বে ছিলনা। তথায় প্রবেশ করা তাঁহার জন্য অসম্ভব ছিল। এতদ্ব্যতীত আদৌও কোন প্রকারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়না যে ঐ জায়গায় 'হায়কল' নামে কোন পুরোহিত মওজুদ ছিল। এই কাহিনিটিই কল্পিত কাহিনী। এখন দেখুন ইব্রাহীম (আঃ) কিভাবে কোরবানী করিলেন। (বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী—অনুবাদক) তথায় ইব্রাহীম (আঃ) কোরবানীগাহ্‌ তৈয়ার করিলেন এবং কাঠ চিরিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্র ইসহাককে বাঁধিলেন এবং কোরবানীগাহের কাঠের উপর রাখিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে জবেহ করার জন্য হাতে ছুরি লইলেন। তখন খোদাতায়ালার ফেরেশতাগণ আকাশ হইতে ডাক দিলেন, হে ইব্রাহীম, হে ইব্রাহীম! তিনি বলিলেন "আমি উপস্থিত রহিয়াছি।" ফেরেশতাগণ বলিলেন, তুমি ছেলের উপর ছুরি চালাইওনা। এইভাবে কোরবানী হইতে পুত্রের জীবন রক্ষা করা হইল। ইহার পরিবর্ত্তে অতঃপর কি হইল? ইব্রাহীম (আঃ) দৃষ্টি ফিরাইলেন এবং পিছনে একটি ভেড়া দেখিতে পাইলেন। উহার শিং জংগলের সংগে আটকাইয়া ছিল। তখন ইব্রাহীম (আঃ) গিয়া এই ভেড়াকে ধরিলেন এবং স্বীয় পুত্রের পরিবর্ত্তে উহাকে সোখ্‌তনী কোরবানীর জন্য জন্য চড়াইলেন।

এইখানে অনেক ভুল কথাই রহিয়াছে। কিন্তু এখন এই বিতর্কের সময় নয়। কেননা তাহাতে এই বিষয়বস্তুটির কলেবর বাড়িয়া যাইবে এবং আসল বিষয় হইতে পুত্র বাদ পড়িয়া যাইবে। কোরবানীর যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে, উহাতে বল প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে এবং উহাকে নেহায়েতই একটি জালেমানা কোরবানী বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্নিত হইয়াছে যে, পুত্রকে দেখাইয়া চিতা তৈয়ার করা হইয়াছিল যে, এইখানে তোমাকে পোড়ানো হইবে। দুইজন যুবককে সংগে

লওয়া হইয়াছিল। তাহারা ইসহাককে জোরপূর্বক চিতার উপর বাঁধিল এবং তাহার উপর ছুরি ঘুরাইতে লাগিল। কোরআন করীম যে বর্ণনা দিয়াছে, উহা ইহা হইতে সম্পূর্ন সতন্ত্র। এই কোরবানীর মোকাবেলায় কোরআন করীম বলে যে, কোন প্রকারের কোন জবরদস্তি করা হয়নাই এবং ইব্রাহীম (আঃ) এই মেজাজের মানুষ ছিলেননা। কোনই ধর্ম কাহাকেও এই অধিকার দেয়না যে, বলপূর্বক অন্যকে কোরবানী কর।

বস্তুতঃ কোরআন করীমে যে চিত্র অংকন করা হইয়াছে তাহা এই যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে ঐ সময় সংগে লইয়া গিয়াছিলেন যখন তাহার (ইসমাইলের) জ্ঞান হইয়াছিল, না যখন কেবলমাত্র তিনি কথা বলিতে পারিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ সময় ইসমাইলকে সংগে লইয়া গিয়াছিলেন যখন তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত বয়স হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন তিনি সাবালক হইলেন বা সাবালকত্বে পেঁাছিতে ছিলেন এবং একলা ছিলেন ও সংগে অন্য কেহ ছিলনা। কেননা কোন জবরদস্তির প্রয়োজন ছিলনা। বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি انی اذبحک যে আমি তোমাকে জবেহ্‌ করিতেছি। তুমি আমাকে বল, তোমার নিকট এই স্বপ্নের কি তাবীর হইতে পারে বা এই ব্যাপারে তোমার ইচ্ছা কি ?"

ইহার মধ্যে মানুষের মর্য্যাদাকে জিন্দা করার মত ঘটনা নিহিত রহিয়াছে। পিতাকে বলা হইতেছে যে পুত্রকে জবেহ করা হইতেছে। পিতা নিজের পুণ্যকে স্বীয় পুত্রের উপর চাপাইয়া দেন না। যদি খোদাতায়ালা অন্য কাহাকেও কোরবানী করার অধিকার দান করিতেন, তাহা হইলে উহা পিতাকে দান করিতেন যে, পুত্রকে কোরবানী কর। ইহার চাইতে বেশী অধিকার কায়েম হইতে পারেনা। কিন্তু নিশ্চিত স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও পিতা (হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম) পুত্রকে (হযরত ইসমাইলকে) অধিকার দান করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, "যখন আমি তোমাকে জবেহ্‌ করিব তখনতো আমি আমার নফসের কোরবানী করিব। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে তোমার রায় কি ? যত ক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি হাঁ বলিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে জবেহ করার আমার কোন অধিকার নাই।" মানুষের মর্য্যাদাকে কত মহানুভবতার সহিত জিন্দা করা হইয়াছে। কত উত্তমরূপে ইহার হেফাজত করা হইয়াছে। উত্তরে পুত্র বলিতেছে যে, "হে আমার পিতা ! আল্লাহ তোমাকে যেইভাবে আদেশ দিয়াছেন, সেইভাবে আদেশ পালন কর। ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین (ইনশাল্লাহ অবশ্যই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাইবেন)। আমিও তোমারই মত তোমারই সন্তান। তুমি দেখিবে যে, আমিও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই উত্তর পাইলেন তখন তিনি পুত্র ইসমাইলকে উপুড় করিয়া শোয়াইলেন যাহাতে চোখে চোখ রাখিয়া দেখিতে না হয়। পিতা পুত্রকে দেখিতে পায়না এবং পুত্র পিতাকে দেখিতে পায় না। কত বেদনাদায়ক ব্যাপার ! 'হালিম', 'আওয়াহ্‌' (কোমল স্বভাব বিশিষ্ট ও বিনয়াবনত) ইত্যাদি রূপে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যে চিত্র অংকন করা হইয়াছে, এই ঘটনার মাধ্যমে উক্ত চিত্রের যথার্থতা সপ্রমাণিত হয় এবং ইহা একটি অত্যন্ত মহান কোরবানীর মর্য্যাদা লাভ করে। তখন আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বলেন, قد صدقت الرویا (তুমি স্বপ্নকে পূর্ণ করিয়াছ)।

কোরআন করীমে ইহা পাওয়া যায়না যে, আকাশ হইতে কোন ভেড়াকে পাঠানো হইয়াছিল এবং তথায় জংগলের মধ্যে উহাকে পাওয়া গিয়াছিল। কোরআন করীমতো এই কথা বলে যে, "হে ইব্রাহীম (আঃ) ! তুমি তোমার স্বপ্নকে পূর্বেই পূর্ণ করিয়া দিয়াছ।" ইহা দ্বারা ঐ আজিমুশশান হিজরতের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে, যাহার দরুন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাইলকে খানা কাবার সন্নিকটে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। এই স্বপ্ন তিনি (হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম) পূর্বেই দেখিয়াছিলেন। যখন তিনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ঐ সময় হযরত ইসমাইল খুব ছোট ছিলেন এবং জানা যায় যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই ব্যাপারে অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ দুইটি আকাংখার উদয় হইয়াছিল। একটি আকাংখা হইল এই যে যেইভাবে আল্লাহ কর্তৃক বলা হইয়াছে আমি আমার পুত্রকে এখনই কোরবানী করিব এবং বিলম্ব করিবনা।

দ্বিতীয়টি হইল এই যে তিনি খোদার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। খোদা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব যে তিনি খোদার ইচ্ছা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না? খোদার ইচ্ছার মর্ম্মার্থ অনুযায়ী কোন মানুষ অন্য কাহাকেও জবরদস্তি কোরবানী করিতে পারে না। অতএব কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? প্রথমতঃ তিনি স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যাগত অর্থ) করিলেন এবং এই তাবীর করিলেন যে, খোদার জন্য ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করিয়া দেওয়াই কোরবানী। অতএব খোদার প্রথম গৃহে (খানা কাবায়) যাইয়া আমি তাহার (হযরত ইসমাইলের) মাকে ও তাহাকে তথায় ছাড়িয়া আসিব। যদি এই তাবীর সঠিক হয় তাহাহইলে এক অর্থে আমি প্রাণের কোরবানীও করিয়াছি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কেননা তথায় খাওয়ার জন্যও কিছু পাওয়া যায়না এবং পরার জন্যও কিছু পাওয়া যায়না। অতএব ইহাতে জবেহ্‌ করার একটি অর্থ পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু নিজ হাতে ছুরির দ্বারা জবেহ্‌ করা এবং এই বিপদজনক অবস্থায় ছাড়িয়া আসা যেখানে জীবন বিপদাপন্ন হয়—এই দুইটির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রহিয়াছে। কিন্তু কোরবানীর মর্ম্মার্থ, যদ্দ্বারা সন্তানকে ওয়াক্‌ফ করা বুঝায় এবং যাহা আল্লাহরও ইচ্ছা, উহার উপর আমি আমল করিব। বস্তুতঃ তিনি এইরূপই করিয়াছিলেন।

কিন্তু জানা যায় যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর হৃদয়ে এই ব্যাপারে হামেশাই একটি খট্‌কা ছিল যে, যেইভাবে খোদা আমাকে বাহ্যতঃ দেখাইয়াছেন এবং আমাকে যে দৃশ্য দেখানো হইয়াছে উহাতো আমি করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি এই কথাও জানিতেন যে, খোদাতায়ালা জবরদস্তিমূলক কোরবানীর অনুমতি দান করেন না। এইজন্য তিনি অপেক্ষা করিলেন। যতদিন পর্যান্ত না হযরত ইসমাইল ঐ বয়ঃসীমায় পেঁাছিলেন, যেই বয়সে মানুষ নিজের পক্ষে বা বিপক্ষে ফয়সালা করিতে পারে, ঐ সময় পর্যান্ত তিনি অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন হযরত ইসমাইল উক্ত বয়ঃসীমায় পেঁাছিলেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে সংগে লইলেন এবং নির্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল তোমার ইচ্ছা কি?"

এই সকল ধারনার মধ্যে ও এই সকল ঘটনার বর্ণনার মধ্যেও এবং কোরবানীর রুহের প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যেও কত বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। অবাক হইতে হয়, খৃষ্টানগণ সরাসরি এই কথা বলে যে, নাউযুবিল্লাহ, কোরআন এই সকল কথা চুরি করিয়াছে। তোমাদের বাইবেলে যত ভুল ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাদের একটিও কোরআনে মওজুদ নাই। যত ভয়ংকর ধর্মীয় ধ্যান-ধারনা বাইবেলে রহিয়াছে, কোরআনের বর্ণনায় উহার ইংগিত নাই। তারপরও বল চুরি করা হইয়াছে। ইহাতো এইরূপ কথা যে, অচল মুদ্রা চুরি হইয়া গিয়াছে এবং ফিরিয়া পাওয়ার সময় খাঁটি মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঝিলিক মারিয়া হিরা জহরতের মত খাঁটি মুদ্রা বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহাকেই তোমরা চুরি বল?

এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাচীনতম গৃহ অর্থাৎ খানা-কাবা ব্যতীত কোরবানীর আর কোন প্রমাণ নাই। কেননা এই গৃহ ছাড়া অন্য কিছুর সহিত কোরবানীর প্রথা সম্পৃক্ত নয়। যেই পুত্রের কোরবানীর কথা বলা হয় ঐ পুত্র ইসমাইল ছাড়া আর কেহ প্রমাণিত হয় না। কেননা ঐ কোরবানীতো ইসমাইলের বাসস্থান, যেখানে তাহাকে ছাড়িয়া আসা হইয়াছিল, উহার সহিত সম্পৃক্ত। পূর্বোক্ত হায়কলের সহিতও ইহা সম্পৃক্ত নয়। তাহা হইলে তথায় কেন হজ্ব শুরু হইয়া যায় নাই? দূর দূরান্ত হইতে তথায় কেন লোকজন যায় না এবং এই অনাচারকে তাজা করার জন্য কোরবানী পেশ করে না? এতএব ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, ঘটনার সাক্ষ্য এবং বাইবেলের অভ্যান্তরীন বিরোধ—এই সব কিছু অনিবার্য্যভাবে ইহা প্রমাণ করিতেছে যে, কোরআন

করীমের বর্ণনাই সত্য এবং কোরআন করীম যেই রূহ্ বর্ণনা করে উহাই বাঁচিয়া থাকার যোগ্য। ব্যাপার যখন একবার বিগড়াইয়া যায় এবং একবার যখন ইলাহি কালামের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় তখন চিরতরে ঐ জাতি হোঁচট খাইয়া যায়।

বস্তুতঃ জবরদস্তির এই ধারনা কেবলমাত্র একবারই সৃষ্টি হয় নাই। কোরবানীর ব্যাপারে সূচনাতেও জবরদস্তি দেখা যায় এবং শেষেও জবরদস্তি দেখা যায়। হযরত ঈসা (আঃ)-কে পশুর মত জবরদস্তি কোরবানী দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্ররূপে পেশ করা হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রেও জবরদস্তির ছুরি চালানো হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ পুত্র সারা রাত্রি কাঁদে এবং চীৎকার দেয়। তাঁহার সহিত যে সকল হাওয়ারী ছিল, তাহারাও নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু হইয়া পড়ে। তিনি তাহাদিগকে ধমক দেন, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তোমরা অদ্ভূত মানুষ। তোমাদের হুশ নাই যে, কি ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে। উঠ, কাঁদ এবং গিরিয়াজারী কর যেন খোদা মৃত্যুর এই পেয়ালাকে অপসারণ করেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা ছুরি লইলেন এবং জবরদস্তি করিলেন এবং ঐ ছুরি এইভাবে চলিল যেইভাবে ইব্রাহীমের (আঃ) ছুরি জবরদস্তির সহিত চলিয়াছিল। যখন তাঁহাকে (হযরত ঈসা আলাইহেস সালামকে) ক্রুশে চড়াইয়া দেওয়া হয় তখন তাঁহার সর্বশেষ বেদনাদায়ক উক্তি ছিল, "এলি এলি লামা সাবাকতানি" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি এইভাবেও জবরদস্তি কর? বরং তুমিতো তোমার প্রতিজ্ঞাতেও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছ। দোওয়ার পর তুমিতো আমাকে এই সুসংবাদ দান করিয়াছিলে যে আমি তোমার দোওয়া কবুল করিয়াছি। এখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। এখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?"

উভয় ঘটনাই বস্তুতঃ একই মূল জবরদস্তির ফলশ্রুতি। ইলাহী কালামের সহিত জবরদস্তির অনুমতি দেওয়া যাইতে পারা যায় না। যখনই আপনারা ইলাহী কালামকে বিগড়াইবেন তখনই সমস্ত ব্যবস্থা উলট পালট হইয়া যাইবে। তখন একটি ভুল অন্য ভুলের জন্ম দিবে। মূলনীতি ইহা ছিল এবং সর্বদাই আছে ও সর্বদা থাকিবে যে খোদা ঐ কোরবানীই গ্রহণ করেন যাহা তোমরা নিজেরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে পেশ কর। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এই অধিকার দান করেননা যে, তাঁহাকে খুশী করার জন্য জবরদস্তি অন্যকে কোরবানী কর। বস্তুতঃ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে যখন এই কোরবানীর বাস্তব চিত্র পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল, তখন চতুর্দিক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার গোলামেরা স্বেচ্ছাকৃত কোরবাণী পেশ করিতে ছিলেন। হজ্জের সময় 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' এর যে ধ্বনি শুনা যায়, উহাও এই স্বেচ্ছাকৃত কোরবানীর দৃশ্য পেশ করে যে, হে খোদা! আমাদের আত্মা হাজির, আমাদের প্রাণ হাজির এবং আমরা কোরবান হইতেছি। আমাদের এই অধিকার নাই যে, অন্যকে তোমার হুজুরে কোরবানী করিয়া দেই।

বস্তুতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে আপনারা এমন কোন ঘটনা দেখিবেন না যে তিনি অন্যকে পাকড়াও করিয়া জবরদস্তি করিয়া কোরবানী লইয়াছেন। হাঁ, মুসলমানেরা ভেড়ার ন্যায় কোরবানী হইয়াছে। তাহারা বক্রীর মত জবেহ্ হইয়াছে এবং অন্যেরা তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে। অতএব কেবলমাত্র ইহাই নহে যে দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক হইতে কোরআন করীমে কোরবানীর রূহ ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে যে নিজের নফসের কোবানী পেশ কর এবং খোদার নামে অন্যকে কোর-

বানী করিওনা, বরং আমলের দিক হইতেও এইরূপ পবিত্র নকসা অংকন করা হইয়াছে যে, জবরদস্তি যাহারা কোরবানী করে তাহারা উহাদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সতন্ত্র হইয়া গিয়াছে যাহারা সেচ্ছায় কোরবানী করে। একদিকে মোশরেকেরা ছিল এবং খোদার অস্বীকারকারীরা ছিল এবং ইহুদীরা ছিল, যাহারা বলপূর্বক মুসলমানদিগকে কোরবানী করাকেই খোদাকে খুশী করার উপায় মনে করিত। অন্যদিকে ঐ সকল মুসলমান ছিল যাহারা খোদার রাস্তায় সেচ্ছাকৃতভাবে আত্মদান করাকে কোরবানীর রূহ মনে করিত। বস্তুতঃ ইসলামের পক্ষ হইতে যত কোরবানী পেশ করা হইয়াছে, ঐগুলি সেচ্ছাকৃত কোরবানী এবং যত কোরবানী নেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে, ঐগুলি হইল জবরদস্তির কোরবানী। ইহাতো হইল ঐতিহাসিক ঘটনা।

কিন্তু আজিকার যুগে পৃথিবীতে এত বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যায় যে, যেই মুসলমান-দিগকে দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক হইতে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে তোমরা অন্যের কোরবানী নিওনা, বরং নিজেদের কোরবানী পেশ করিও, যেই মুসলমানদিগকে আমলের দিক হইতেও এত আজিমুশশান ও এত মর্মস্পর্শী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে খোদা তাঁহার ঐ সকল প্রিয় বান্দা, যাহাদের চাইতে অধিক প্রিয় বান্দা আজিকার যুগে কল্পনাও করা যায় না, তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা কোরবানীর বক্রীর মত পেশ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে জবেহ করা হইতেছিল, এতদসত্ত্বেও মুসলমানেরা উক্ত শিক্ষা ভুলিয়া বসিয়াছে। আজ কোরবানীর এই ধারণা দেওয়া হইতেছে যে, অন্যদেরকে জবরদস্তি হত্যা কর, তাহাদিগকে মার, তাহাদের ধন সম্পদ লুট তরাজ কর, তাহাদের ধন সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দাও, তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা কর, তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দাও এবং সকল প্রকারের মানবিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দাও। তাহা হইলে খোদা খুশী হইবেন এবং খোদার সন্তুষ্টি ইহার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। যতই মির্জায়ীকে (আহমদীদিগকে) হত্যা করিবে ততই নিশ্চিত জান্নাত তোমরা লাভ করিতে থাকিবে। ইসলাম ও মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামে তোমরা যত স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করিবে, তত অধিক তোমরা খোদার নৈকট্য লাভ করিতে থাকিবে। যত গৃহ তোমরা জ্বালাইয়া দিবে, তোমাদের জন্য উহার চাইতেও বেশী গৃহ জান্নাতে তৈয়ার হইতে থাকিবে। যত ধন-সম্পদ তোমরা লুট করিবে, তোমাদের ধন-সম্পদ ততখানি বরকতপূর্ণ হইবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ হালাল থাকিবে।

কিন্তু কোরআন করীম যেই ধারণা পেশ করিয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার প্রিয়জনদের কোরবানীর মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ ইতিহাস তাঁহারা তাঁহাদের রক্ত দ্বারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর কোন মানুষ ঐ ইতিহাস মুছিয়া ফেলিতে পারিবেনা। অন্যেরাও যখন ঐ ইতিহাস অধ্যায়ন করে, তখন তাঁহাদের কোরবানীর সামনে এবং ঐ সকল মোজাহিদের সামনে তাহাদের মস্তক অবনত করিতে হয়। আজ উক্ত নকসা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আহমদীদের জন্য ইহার চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, তাহারা উক্ত নকসার উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা অন্যের কোরবানী নেয়না। তাহারা নিজদিগকে কোরবানী করে। তাহাদের (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারীদের) জাহেলিয়তের

ফলশ্রুতিতে আমরা এই সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাহাদের ভাগ্য তাহাদের সহিত রহিয়াছে। ইসলাম সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা তাহাদের সংগে রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এবং আমাদের অদৃষ্ট দীপ্ত হইয়াছে এবং ইহা কোরবানী দেওয়ার ফলে হইয়াছে, কোরবানী নেওয়ার ফলে হয় নাই। এই সত্যের উপর যদি আহমদীয়াত সর্বদা কায়েম থাকে, তাহা হইলে কেহই কোনদিন আহমদীয়াতকে ধ্বংস করিতে পারিবেনা। যাহারা কোরবানী দেয় তাহারা কখনো ধ্বংস হয় নাই। সর্বদাই তাহাদের নাম বরকতপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের ধন-সম্পদ বরকতপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা আকাশের নক্ষত্ররাজির মত উজ্জল হইয়া গিয়াছে। খোদার দৃষ্টিতে তাহারা হীরা জহরতের চাইতে অধিক মূল্যবান হইয়া গিয়াছে। তাহারা পৃথিবীর সারবস্তুরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহাদের নামে নুতন জগত সৃষ্টি হইয়াছে।

যখন হযরত নূহ (আঃ) এর সহিত কতিপয় মানুষ ছিল, তখন ইলাহী কালাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল যে, "তোমরা কতিপয় নও। তোমরা আদিপুরুষে পরিণত হইবে। তোমাদের দ্বারা নুতন উম্মতের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।" তেমনিভাবে (হে আহমদীগণ!) তোমরা পরিণতি নও। তোমরা হইতেছ হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ যে সকল কোরবানী খোদার হুজুরে পেশ করিয়াছিলেন, উহাদের সূচনা এবং নব সূচনা। যদি তোমরা ইহাকে স্থায়ীত্ব দান কর, তাহাহইলে তোমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদিপুরুষে পরিণত হইবে। তোমাদের দ্বারা নুতন উম্মত জারী করা হইবে। তোমাদের নামে বংশাবলীর সূচনা হইবে। অতএব সর্বদাই ইহার উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং এই কোরবানীকে কখনো নিজ হস্তে নষ্ট করিয়া দিবেনা। তোমাদের মধ্যে ইব্রাহীমী সুন্নত জিন্দা হইবে। যেইভাবে প্রস্রবন প্রবাহিত হয়, সেইভাবে তোমাদের বংশ হইতে ইসমাইলী সুন্নত প্রবাহিত হইবে এবং তোমাদের সন্তানেরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্মৃতি জিন্দা করিবে। কেননা আজ তোমরা এই বিষয়গুলিকে জিন্দা করিতেছ। আজ এইগুলি তোমাদের দ্বারা দীপ্তিলাভ করিতেছে। আজ তোমাদের দরুন এই সকল কোরবানীর মাহাত্ম ও রুহ জিন্দা রহিয়াছে। অতএব এই সওদা লোকসানের সওদা নয়। এই সকল কোরবানী তোমাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে—এই ভীতি এইরূপ একটি জাহেলিয়াত পূর্ণ ভীতি, যাহা কোন আহমদীর ধ্যান-ধারণার ধার দিয়াও ঘেঁষিতে পারেনা।

পৃথিবীর মানুষ কবে এই সকল কোরবানীকে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে? তাহারাতো ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল কোরবানীর মাহাত্ম্য পর্যন্ত তাহারা পৌঁছিতে পারেনা। ইহাতো আকাশে উত্তোলনকারী কোরবানী। মাটির মানুষ এই সকল কোরবানীকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে? না এই সকল কোরবানী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, না এই সকল কোরবানী যাহারা দেয় তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে সদা সর্বদা গৌরবের সহিত ইতিহাসের পাতায় স্মরণ রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে, বরং পার্থিব বিজয়ের সৌভাগ্যও

তাহারা লাভ করিয়াছে এবং পরকালের জান্নাতের সুসংবাদ ধ্বনিও তাহদের নিকট পেঁৗছিয়াছে। এই শিক্ষাই আমরা কোরআন হইতে শিখিয়াছি। যাহা আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা শিখাইয়াছে, তাহা হইল জবরদস্তি কোরবানী নেওয়ার শিক্ষা। খোদাই জানেন তাহারা কোথা হইতে ইহা শিখিয়াছে! তাহারা কি ইহা বাইবেল হইতে শিখিয়াছে? অথবা তাহারা কি ইহা ঐ সকল শয়তানী ধর্ম হইতে শিখিয়াছে, যেখানে সর্বদাই এই রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে যে বলপূর্বক কাহাকেও কোরবানী করিয়া দাও?

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সর্বদাই উপরোক্ত কোরবানীর রুহ্‌কে জিন্দা করার তৌফিক দান করুন এবং আহমদীয়া জামাতকে সর্বদাই এই তৌফিক দান করুন, যেন তাহারা এই পথে কায়েম থাকে, দৃঢ়চিত্ত থাকে এবং তাহারা যেন সাহস ও খোদার উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ না করে। তাহারা বড়ই ভাগ্যবান, যাহারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে নিশ্চয় দেখিবে। বরং তাহাদের সামনে অন্ধকারের বাসিন্দাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে এবং তাহারা আলোর ফল্গুধারা নির্গত হইতে দেখিবে। আরও অধিক ভাগ্যবান তাহারা, যাহারা ইহার পূর্বেই খোদার রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া দিবে এবং তাহারা নিজদিগকে উহাদের চাইতে উত্তম মনে করিবে, যাহাদিগকে তাহারা এই আনন্দের দিন দেখার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া যাইবে। কিন্তু অবস্থা যাহাই হউক না কেন, বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য আমাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে, এই ভাগ্যকে রুখিয়া দিতে পারে।

সানী খোৎবায় হুজুর বলেন :—

পাকিস্তানে যাহাদিগকে খোদার নামে কয়েদ করা হইয়াছে এবং যাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কায়েম রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী এবং সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে এই সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কিছু খোদা-ভীরু বিচারক কিছু সংখ্যক আহমদীকে জামিনে খালাস করিয়াছেন, যদিও তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কায়েম রহিয়াছে। আমাদের সম্মানিত ভ্রাতা মোকাররম চৌধুরী জিহুর আহমদ বাজুয়া সাহেব, মোকাররম হাকিম খোরশেদ আহমদ সাহেব, খাজা আবদুল মজিদ সাহেব, মৌলভী আবদুল আজিজ (ভামরী) সাহেব এবং ওয়াসিম আনোওয়ার ও মোবারক আহমদ—এই ছয়জন অত্যন্ত জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে ওয়াসিম আনোয়ার ও মোবারক আহমদকে যারপরনাই বেদনাদায়ক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে খুবই দৃঢ়চিত্ত থাকার তৌফিক দান করিয়াছেন। আপনাদের জন্য বড় সুসংবাদ এই যে, দুইদিন পূর্বে তাহাদের সকলকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই আজ আল্লাহতায়ালার ফজলে নিজ নিজ গৃহে এই ঈদ উদযাপন করিতেছে। যদিও ইহা সাময়িক মুক্তি, তথাপি ইহা আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবানী। আমরা তাঁহার শোকর আদায় করি। আল্লাহতায়ালা ভবিষ্যতেও তাহাদিগকে দৃঢ়তা প্রদর্শনের তৌফিক দান করুন। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে সকল অকল্যাণে হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদের অন্যান্য মজলুম ভাইয়েরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসুক।

ঈদের পর মোসাফা (করমর্দন) করার একটি রীতি কাদিয়ানে চলিয়া আসিতেছে। ঈদুল ফিতরের পর আমিও মুসাফা করিয়াছি। কিন্তু ঈদুল আজহার সংগে একটি সুন্নতের সম্পর্ক রহিয়াছে এবং উহা হইতেছে এই যে ঈদের পর জলদি জলদি নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাওয়া উচিত এবং কোরবানী দেওয়ার পর যদি কোন কোরবানীর মাংস প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে উহা ভুনিয়া উহা দ্বারা ইফতার করা উচিত। অতএব এই সুন্নতের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। এই জন্য আজ আমি মোকামী ইমাম সাহেবকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছি যে ঈদুল আজহার পর মুসাফা করা সমচীন হইবে না। কেননা ইহাতে লোকজনদের ঘরে ফিরিয়া যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়। গত বৎসর মহিলাদের তরফ হইতে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে মোসাফা না হউক, অন্ততঃ আমাদিগকে আচ্ছালামোয়ালাইকুম বলিয়া দেওয়া যাইত এবং ঈদ মোবারক দেওয়া যাইত। এইজন্য তাহাদের দিকে যাইয়া আমি তাহাদিগকে আচ্ছালামোয়ালাইকুম বলিব এবং ঈদ মোবারক দিব। অতঃপর সকল বন্ধু স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। এই সুন্নত জারি রাখুন যে আপনারা যেই রাস্তা ধরিয়া আসেন, ফিরিয়া যাওয়ার সময় ঐ রাস্তা পরিবর্ত্তন করুন এবং যদি আসার সময় আপনারা "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ" তকবিরাত বলিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ফিরার পথে অবশ্যই এই তকবির পড়িতে পড়িতে যাইবেন। কথা বার্ত্তা না বলিয়া এবং গল্প না করিয়া তকবির, হামদ এবং তহলীল তৌহিদের এলান) করিতে আপনারা ঘরে ফিরিয়া যাইবেন ; আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক নসিব করুন। আমীন।

অতঃপর হুজুর আকদাস দোওয়া পরিচালনা করেন এবং সকলকে আচ্ছালামোয়ালাইকুম ও ঈদ মোবারক বলিয়া প্রস্থান করেন।

(লণ্ডনে ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত খোৎবা) অনুলিপি হইতে অনুদিত

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভূঁইয়া**

ওয়াকফে জদীদের চাঁদা আদায়ের তাকিদ

এতদ্বারা বাংলাদেশের সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ওয়াকফে জদীদের বৎসর ১৯৮৫ (জানুয়রী হইতে ডিসেম্বর) সনের সাত মাস অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নির পক্ষে নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদার কমপক্ষে ২/১ হিস্যা আদায় করা জরুরী। এই চাঁদা নবজাত শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল আহমদীর জন্য অবশ্য দেয় এবং ইহার বার্ষিক হার ন্যূনকল্পে ১২/টাকা। যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী ১৯৮৫ সনের জন্য এখনো ওয়াকফে জদীদের ওয়াদা করেন নাই তাহারা শীঘ্র ওয়াদা করতঃ কমপক্ষে ২/১ অংশ আদায় করিবেন।

সকল স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রতি আরজ এই তাঁহারা স্ব স্ব জামাতের সকল সদস্যের ওয়াদা গ্রহণ ও লক্ষ্যমাত্রায় চাঁদা আদায়ে তৎপর হউন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াসসালাম

খাকচার

মোঃ ফজলুর রহমান

সেক্রেটারী, ওয়াকফে জদীদ বাঃ আঃ আঃ

একটি চক্রান্ত সম্বন্ধে জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বিগত ২-৮-৮৫ তারিখে "জনাব পীর সাহিব" সম্বোধন করিয়া একটি মিথ্যা ও বানোয়াট পত্র কে বা কাহারা লিখিয়াছে এবং আহমদীয়া জামাতের একজন গণ্যমান্য কর্মকর্তার নাম উক্ত পত্রের লিখক রূপে ব্যবহার করিয়াছে। উক্ত পীর সাহেবের নাম-ঠিকানা কিছুই পত্রটিতে নাই। পত্রটির একটি ফটোস্টেট কপি জনৈক পীর সাহেবের মুরীদের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত পত্রটি পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কেননা পত্রটিতে পীর সাহেবকে বেয়াদবীপূর্ণ ভাষায় গালি-গালাজ ও হিংসাত্মক হুমকি প্রদান করা হইয়াছে। আহমদীয়া জামাতের কর্মকর্তা তো দূরের কথা, জামাতের একজন সাধারণ সদস্যও এইরূপ পত্র লেখার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। আমরা আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষানুযায়ী শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখিয়া প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সহিত বিশ্বব্যপী ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত রহিয়াছি। বিগত প্রায় একশত বৎসরের ইতিহাসে আহমদীয়া জামাত এই মহান ইসলামী শিক্ষা ও খাতামান-নবীঈন হযরত মোহম্মদ (সাঃ)-এর সুউচ্চ আদর্শ ব্যাতিক্রমহীনভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

আমরা আরও বিস্মিত হইয়াছি যে, উক্ত বানোয়াট পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রচার-পত্র বিলি করা হইয়াছে। এই প্রচার-পত্রে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হইয়াছে এবং শান্তি-শৃংখলা ভংগের অশুভ চক্রান্ত করা হইয়াছে। এই প্রচার-পত্রে এইরূপ অশালীন, মিথ্যা ও গালি-গালাজপূর্ণ লোক-উস্কানীমূলক ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ধর্মপরয়াণতার পরিপন্থী।

উপরোক্ত ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে কতিপয় ব্যক্তি আহমদীয়া জামাতের নাম ব্যবহার করিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে দেশে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করিতেছে।

কাজেই উক্ত বানোয়াট, মিথ্যা ও কৃত্রিম পত্রটি জামাতের কোনও শত্রুর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পত্রের সাথে আমাদের জামাতের দূরতম সম্পর্কও নাই।

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

শত বার্ষিকী জুবিলী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আসসালামোআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতহু,

জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদেরকে বিশেষভাবে জানানো যাইতেছে যে, ১৬ বছর ব্যাপী শত বার্ষিকী জুবলীর চাঁদা আদায়ের আর মাত্র ১ বৎসর ৫ মাস বাকী আছে। অর্থাৎ ১৯৮৭ সনের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সকলের ওয়াদা অবশ্যই পুরা করিতে হইবে। কারণ হুজুর (আইঃ) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সনের পূর্বেই এই প্রোগ্রামের যাবতীয় কাজ সমাধা করিবার কথা ঘোষণা করে ১৯৮৭ সনের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চাঁদা আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

অতএব যে সব ভ্রাতা ও ভগ্নী ওয়াদাকৃত চাঁদা এখনো পরিশোধ করেন নাই এবং যারা এখনো এই তাহরিকে ওয়াদা করেন নাই তাহাদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব চাঁদা আদায় করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই ব্যাপারে স্থানীয় জামাতের সকল আমীর ও প্রেসিডেন্ট সাহেবকে স্মরণ করানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এখন হইতে আপনার জামাতে বিশেষ প্রোগ্রাম গ্রহণ করিয়া উক্ত খাতের চাঁদা আদায় করিতে সচেষ্ট হইবেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, শতবার্ষিকী রুহানী পরিকল্পনার মসনুন দোয়া, মাসিক নফল রোজা এবং প্রতিদিন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করিয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া জারী রাখিতে সকলের খেদমতে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
সেক্রেটারী, শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

পূর্বেকার দু এক যুগ হতে শুরু করে তাঁদের জীবন কাল এবং তিরোধানের পরও দীর্ঘকাল—যতদিন তাঁদের আদর্শ সক্রিয় থাকে ও ভবিষ্যৎবাণী সমূহ পূর্ণ হতে থাকে ততদিন তাদের সময়কাল হিসাবে গণ্য করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত মহাযুদ্ধ ও নৈসর্গিক অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বে হযরত মির্যা সাহেব এগুলোর সম্বন্ধে ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও স্পষ্ট সতর্কবাণী প্রচার করে যান। বস্তুত কুরআন শরীফে বহুলরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সতর্ককারী প্রেরণ না করে আযাব দেন না। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১৫ ; সূরা তা-হা ঃ ১৩৪ ইত্যাদি) এ সকল আযাব বা শাস্তিমূলক নৈসর্গিক ঘটনাবলী ঘটার পর ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন হলে তাঁর বেলায়ই কি কুরআন শরীফে বহুল বর্ণিত আল্লাহর অমোঘ বিধানটির ব্যতিক্রম ঘটবে ? যা হোক, আশা করি জনাব মোঃ আবদুল হাই সাহেব এসব বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে সাধারণ পাঠকদেরকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করতে তকলিফ গ্রহণে কার্পন্য করবেন না।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"ইসলামেই নবুয়ত" পুস্তকখানা সরকার ৮-৮-৮৫ তারিখের একটি হুকুম দ্বারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

অতএব, জামাতের ভ্রাতৃবৃন্দ এই আদেশ মান্য করিয়া চলিবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসলোম

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী (ওমুরে আমা)
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

তাং ১০-৮-৮৫

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ)

"অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ) —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)